

ইসলাম শিক্ষা

পঞ্চম শ্রেণি



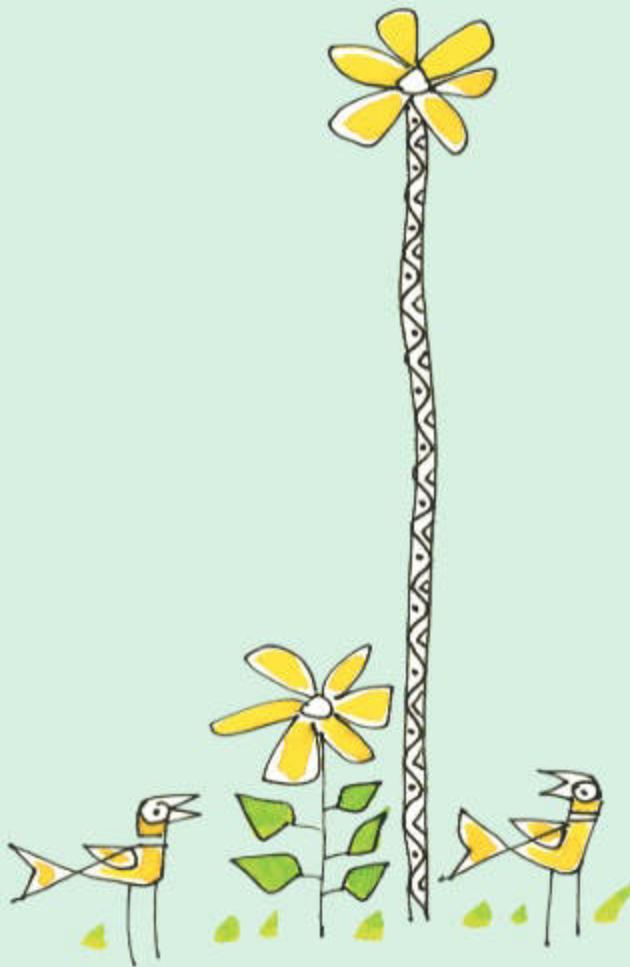
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ইসলাম শিক্ষা

পঞ্চম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা
অধ্যাপক মুহাম্মদ তমীয়ুল্লাহ
অধ্যাপক এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া
মুহাম্মদ কুরবান আলী

শিল্প সম্পাদনা
হাশেম খান

চিত্রাঙ্কন
মোঃ আরিফুল ইসলাম

থ্রু প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১২
পুনর্মুদ্রণ : জুলাই ২০২৩
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

প্রাথমিক সর শিক্ষার ভিত্তিভূমি। প্রাথমিক শিক্ষা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমূল্যায় ও পরিকল্পিত না হলে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই দুর্বল হয়ে পড়ে। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর এবং ধর্ম-বর্ণ কিংবা লৈঙ্গিক পরিচয় কোনো শিশুর শিক্ষাপ্রাথমিক পথে যেন বাধা না হয়ে দাঁড়ায় এ বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান ও উন্নতবিশ্বের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখালো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমূল্য ও ফলপ্রসূ করার ওয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-উপকরণ হলো পাঠ্যপুস্তক। এই কথাটি মাথায় রেখে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সবসময় সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাথমিক দেওয়া হয়েছে। শিশুদের বিচিত্র কৌতুহল এবং ধারণক্ষমতা সম্পর্কে রাখা হয়েছে সজাগ দৃষ্টি। শিখন-শেখালো কার্যক্রম যেন একমূল্য ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুযায় হয়ে ওঠে সেদিকটি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি বই শিশুদের সুব্রহ্ম মনোদৈহিক বিকাশের সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাজিক্ত দক্ষতা, অভিযোগন সক্ষমতা, দেশথেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

উপর্যুক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পঞ্জুম শ্রেণির জন্য ‘ইসলাম শিক্ষা’ পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে পরিচিতি প্রদানের মাধ্যমে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঘটিয়ে ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তনে তাদেরকে সহায়তা প্রদান এ পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য। সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপন ও ইসলামের আদর্শ চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, মানবিক ও নৈতিক গুণাবলি অর্জন ও বিকাশে সক্ষম হয় সে বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

বইটি রচনা, সম্পাদনা ও পরিমার্জনে যেসব বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষক নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন তাদের বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই তাদের প্রতিও যাঁরা অলংকরণের মাধ্যমে বইটিকে শিশুদের জন্য চিন্তাকর্মক করে তুলেছেন। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিচ্ছিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতীত পাঠ্যপুস্তকটিকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সময় বক্লাহর কারণে কিছু ভুলগুটি থেকে যেতে পারে। সুবিজ্ঞনের কাছ থেকে যৌক্তিক পরামর্শ ও নির্দেশনা পেলে সেগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়া হবে।

পরিশেষে বইটি যাদের জন্য, সেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

অক্টোবর ২০২৪

ফরেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ

আল্লাহ তায়ালার পরিচয়	০১
আল্লাহ তায়ালার গুণবলি	০৮
আল্লাহ সারা বিশ্বের পালনকর্তা	০৮
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল	০৮
আল্লাহ অতি সহনশীল	০৮
আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠা, আল্লাহ সর্বশক্তিমান	০৯
নবি-রাসুলের পরিচয়	১০
আখিরাতের প্রতি ইমান	১২
করে সওয়াল-জওয়াব	১৩
করে আমাম অথবা আজাব	১৪
কিয়ামত, হাশর, মিয়ান, জাহান ও জাহানাম	১৫
আখিরাতে বিশ্বাসের নেতৃত্ব উপকার	১৬
একজন মুসলিমের চরিত্র	১৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদত

ইবাদত	২১
পাক-পবিত্রতা	২৩
সালাত	২৩
সালাতের সময়	২৫
সালাত আদায়ের নিয়ম	২৮
সালাতের আইকাম-আরকান	৩৪
সালাতের ঘোষণা	৩৬
মসজিদের আদব	৩৭
সাওম	৩৯
যাকাত	৪২
হজ	৪৪
কুরবানি	৪৭
আকিকা	৫০
ব্যবহারিক দোয়া	৫১
পরিচ্ছন্নতা	৫৩
ধর্মীয় অনুশাসন পালনে অভিযোগতা	৫৪
সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া	৫৬

পৃষ্ঠা

পিতা-মাতার বেদমত	৭৫
শ্রমের মর্যাদা	৭৭
মানবাধিকার ও বিশ্বাত্মক	৮০
গৱাবেশ	৮২
প্রাকৃতিক দুর্যোগ	৮৩

পৃষ্ঠা

৭৫
৭৭
৮০
৮২
৮৩
৯০
৯১
৯৪
৯৫
৯৬
৯৭
৯৮
৯৯
১০০

চতুর্থ অধ্যায়

কুরআন মজিদ শিক্ষা

কুরআন মজিদের পরিচয়	৯০
তাজবিদ, মাখরাজি	৯১
ওয়াক্ফ বা বিরাম চিহ্ন	৯৪
গুনাহ	৯৫
সূরা ফাল	৯৬
সূরা কুরায়শ	৯৭
সূরা মা'উন	৯৮
সূরা কাওছার	৯৯
সূরা কাফিরুন	১০০

পঞ্চম অধ্যায়

মহানবি (স)-এর জীবনাদর্শ ও অন্যান্য নবিগণের পরিচয়

মহানবি (স)-এর জন্ম ও পরিচয়	১০৪
শৈশব ও কৈশোর	১০৫
হাজরে আসওয়াদ স্থাপন	১০৬
হ্যবরত খাদিজার ব্যবসায়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত ও বিবাহ	১০৭
নবুয়ত লাভ	১০৮
ইমানের দাওয়াত	১০৯
ইসলাম প্রচারে তারেক গমন	১১০
মিরাজে গমন	১১১
মদিনায় হিজরত	১১২
আল্লাহর ওপর মহানবি (স)-এর গভীর আশ্চর্য ও আলে বিশ্বাস	১১২
মদিনা সনদ	১১৩
বদর ও অন্যান্য যুদ্ধ	১১৪
হুদাইবিয়ার সম্মিলন	১১৬
মক্কা বিজয়	১১৭
ক্ষমা	১১৭
বিদায় হজ	১১৮
কুরআন মজিদে উপ্লিখিত নবি-রাসুলগণের নাম	১২০
হ্যবরত আদম (আ)	১২০
হ্যবরত নূহ (আ)	১২২
হ্যবরত ইব্রাহীম (আ)	১২৫
হ্যবরত দাউদ (আ)	১২৮
হ্যবরত সুলায়মান (আ)	১২৯
হ্যবরত ইসা (আ)	১৩০

তৃতীয় অধ্যায়

আখলাক বা চরিত্র ও নেতৃত্ব মূল্যবোধ

আখলাক ও নেতৃত্ব মূল্যবোধের একটি আদর্শ কাহিনী	৬৩
সৃষ্টির সেবা	৬৪
দেশপ্রেম	৬৭
ক্ষমা	৬৯
ভালো কাজে সহযোগিতা করা এবং মন্দ কাজে বাধা দেওয়া	৭১
সততা	৭৩

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ الْعَقَائِدُ বিশ্বাস

আল্লাহ তায়ালার পরিচয়

আমরা জানি, কাঠমিঞ্চি কাঠ দিয়ে চেয়ার, টেবিল, খাটসহ আরও অনেক কিছু তৈরি করে। রাজমিঞ্চি ইটের ওপর ইট সাজিয়ে দালানকোঠা তৈরি করে। বড় বড় ইমারত তৈরি করে। এসব কোনো কিছুই নিজে নিজে তৈরি হয় না। কেউ সৃষ্টি না করলে কোনো কিছুই সৃষ্টি হয় না।

আমাদের মাথার ওপর সূন্দর সূনীল আকাশ, মিটিমিটি তারা, গ্রহ-উপগ্রহ, পৃথিবী থেকে তেরো লক্ষ গুণ বড় পৰ্যায়ে সূর্য নিজেই কি সৃষ্টি হয়ে গেছে? না, সবকিছুরই একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। তিনি কে? তিনি মহান আল্লাহ।

সবার আগে আমাদের প্রয়োজন আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা ও ইমান আনা। কেননা মহান আল্লাহ আছেন এ সম্পর্কে যদি আমাদের পূর্ণ ইমান না থাকে, তা হলে কী করে আল্লাহর আদেশ মতো চলব? এর সাথে সাথে প্রয়োজন আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি সম্পর্কে জানা। আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরিক নেই।

আল্লাহ সবকিছু দেখেন, শোনেন এবং সবকিছুর খবর রাখেন- এর ওপর আমাদের দৃঢ় ইমান থাকতে হবে। আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি সম্পর্কে সার্বিক জ্ঞান না থাকলে ইসলামের সরল সহজ পথে চলা কিছুতেই সম্ভব নয়।

এরপর আমাদের জানতে হবে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনযাপন করার সঠিক পথ কোনটি। কী কী কাজ আল্লাহ পছন্দ করেন, যা আমরা করব? আর কোন কোন কাজ অপছন্দ করেন; যা থেকে আমরা দূরে থাকব। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহর আইন ও বিধানের

জ্ঞান অর্জন করা আমাদের জন্য ফরজ। আল্লাহর বিধান আছে কুরআন মজিদে। কুরআন মজিদ আমাদের পড়তে হবে ও বুঝতে হবে। আল্লাহর আদেশগুলো পালন করতে হবে। নিয়েধ থেকে দূরে থাকতে হবে।

আমাদের আরও জানতে হবে, আল্লাহর ইচ্ছার বিরোধী পথে চলার পরিণাম কি? আর তাঁর আদেশ মেনে চলার পুরস্কারই বা কী? এ উদ্দেশ্যে আমাদের কবর, কিয়ামত, হাশর, মিয়ান, জান্নাত ও জাহানাম সম্পর্কে জানা ও ইমান থাকা অপরিহার্য। এ আলোচনায় যেসব বিষয় জানতে ও বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে, তারই নাম হচ্ছে ইমান। ইমান অর্থ বিশ্বাস স্থাপন। যে ব্যক্তি আল্লাহর একত্ব, তাঁর গুণাবলি, তাঁর বিধান এবং তাঁর পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে জানে এবং অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে তাকে বলা হয় মুমিন। আর ইমানের ফল হলো মানুষকে আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে গড়ে তোলা।



প্রাকৃতিক দৃশ্য

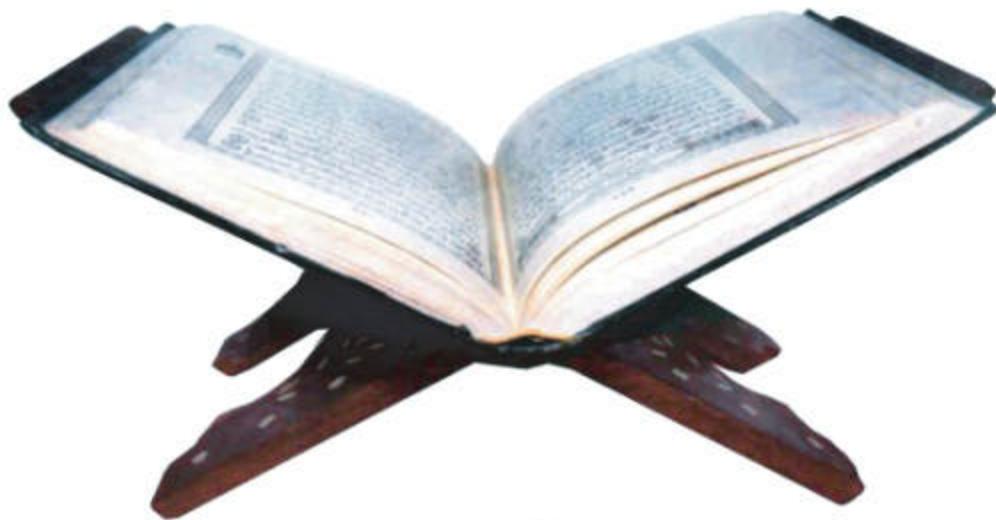
দলীয় কাজ: আল্লাহর পরিচয় জানার জন্য যেসব বিষয়ের জ্ঞান থাকা জরুরি শিক্ষার্থীরা দলে বসে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করে সেসব বিষয়ের একটি তালিকা তৈরি করবে। এরপর মার্কার দিয়ে পোস্টার পেপারে বড় বড় করে লিখবে।

আমরা জানলাম আনুগত্যের জন্য ইমানের প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহর গুণাবলি, তাঁর দেওয়া বিধান ও আখিরাতের জীবন সম্পর্কে আমরা কীভাবে জানব?

আমাদের চারদিকেই ছড়িয়ে রয়েছে আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য সৃষ্টি, যা তাঁর অস্তিত্বের নির্দর্শন। এসব নির্দর্শন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এ সবকিছুই একই স্বীকৃতির সৃষ্টি।

কত সুন্দর আমাদের এই দেশ! কত সুন্দর আমাদের এই পৃথিবী! সবুজ ফসলের মাঠ। মাঠভরা সোনালি ধান। বন, বাগান, গাছ-গাছালি। কূল কূল শব্দে বয়ে যায় নদী। ওপরে নীল আকাশ। রাতে তারা ঝলমল করে। কোনো সময় শীত। কোনো সময় গরম। কোনো সময় ঝারে বৃষ্টি। এ সবই মহান আল্লাহর সৃষ্টি। এসব নির্দর্শনের ভেতরে রয়েছে আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় গুণের প্রকাশ। তাঁর হেকমত, তাঁর জ্ঞান, তাঁর কুরুত, তাঁর দয়া, তাঁর লালন-পালন, এক কথায় তাঁর সব গুণের পরিচয়। এসব নির্দর্শন আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। এসব সৃষ্টি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এ সবকিছুই একই স্বীকৃতির সৃষ্টি।

এ ছাড়া আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানি করে মানুষেরই মধ্য থেকে এমন সব মহামানব সৃষ্টি করেছেন, যাদের তিনি দিয়েছেন নিজের গুণাবলি সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান। মানুষ যাতে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারে, তার নিয়মই তিনি শিখিয়ে দিয়েছেন। আখিরাতের জীবন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দিয়েছেন। এরপর তাঁদের নির্দেশ দিয়েছেন অপর মানুষের নিকট এসব পৌছে দিতে। এরাই হচ্ছেন আল্লাহর নবি-রাসূল। তাঁদের জ্ঞানদানের জন্য আল্লাহ যে মাধ্যম ব্যবহার করেছেন, তার নাম হচ্ছে ওহি। আর যে কিতাবে তাঁদের এ জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাকে বলা হয় আল্লাহর কিতাব। কুরআন মজিদ আল্লাহর কিতাব।



ছবি: আল কুরআন

পরিকল্পিত কাজ : আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তাঁর দশটি সৃষ্টির একটি তালিকা শিক্ষাধীরা তৈরি করে পোস্টার পেগারে মার্কার দিয়ে লিখবে।

আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি

মহান আল্লাহ তায়ালার অনেকগুলো সুন্দর নাম আছে এগুলোকে আসমাউল হুসনা বলে। আল্লাহ তায়ালার গুণে নিজেকে গুণান্বিত করতে পারলে চরিত্র ভালো হয়। ভালো মানুষ হওয়া যায়। যেমন, আল্লাহ দয়ালু। তিনি সবাইকে দয়া করেন। আমরাও সবাইকে দয়া করব। আল্লাহ ‘রব’। তিনি সকল সৃষ্টিকে লালনপালন করেন। আমরাও তাঁর সৃষ্টিকে যথাসাধ্য লালনপালন করব। আল্লাহ ‘রাজ্ঞাক’। তিনি সবার খাদ্য দেন। আমরাও ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেব। তাই ইসলামে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়ার নির্দেশ রয়েছে।

তাখাল্লাকু বিআখলাক্সিল্লাহ - ﴿خَلْقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ﴾

অর্থ : “তোমরা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও।”

আল্লাহর গুণ সম্পর্কে জানা থাকলে আল্লাহর আদেশমতো চলা সহজ হয়। অন্যায় থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়।

আল্লাহ সবকিছু দেখেন

সব কথা শোনেন,
সবকিছুর খবর রাখেন।

এ কথাগুলো জানা থাকলে এবং এ কথাগুলোর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকলে কারও পক্ষে অন্যায় করা সম্ভব নয়। ঠিকভাবে সে আল্লাহর আদেশ মেনে চলতে পারে।

কুরআন মজিদে মহান আল্লাহর অনেক গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো থেকে কয়েকটি গুণের কথা আমরা জানব।

আল্লাহ সারা বিশ্বের পালনকর্তা

আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের নামই হচ্ছে ইসলাম। এই আনুগত্যের জন্য প্রয়োজন আল্লাহ তায়ালার সন্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে জানা ও ইমান আনা। আল্লাহর সন্তা সম্পর্কে পূর্বের পাঠে আমরা জেনেছি। এখন আমরা আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে জানব।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের রব। আমাদের পালনকর্তা। আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সবকিছু লালনপালন করেন। গাছপালা, পশুপাখি, জীবজন্ম, সবারই খাদ্যের প্রয়োজন



গাছপালা, নদীনালা, পাহাড়-পর্বত, বাড়িঘরসহ প্রাকৃতিক দৃশ্য

হয়। লালন-পালনের দরকার পড়ে। সবার খাদ্য এক রকম নয়। আমরা ভাত, মাছ, গোশত, ফলমূল খাই। পশুপাখি খায় ঘাস ও পোকামাকড় ইত্যাদি। কিন্তু গাছপালা এসব কিছু খেতে পারে না। গাছপালার মুখ নেই। তারা মাটি থেকে শিকড় দিয়ে পানি শুষে নেয়। আর বাতাস থেকে নেয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড। এ দিয়ে তারা খাদ্য তৈরি করে।

আমরা সব সময় শ্বাস নিই এবং শ্বাস ফেলি। শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়া কোনো জীব বাঁচে না। জীবের শ্বাস ফেলার সময় কার্বন-ডাই-অক্সাইড যুক্ত বায়ু বের হয়। গাছ এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে খাদ্য তৈরির উপাদান হিসেবে। আর আমাদের জন্য ছাড়ে অক্সিজেন। শ্বাস নেওয়ার সময় আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি। অক্সিজেন ছাড়া কোনো জীব বাঁচতে পারে না। এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় আল্লাহর মহিমা কত বড়। আমাদের জন্য যা বিষ, গাছপালার জন্য তা খাদ্য তৈরির উপাদান। গাছপালার মাধ্যমে আমরা অক্সিজেন পাই, ফলমূল ও খাদ্য পাই। কতভাবে আল্লাহ তায়ালা আমাদের লালন-পালন করেন।



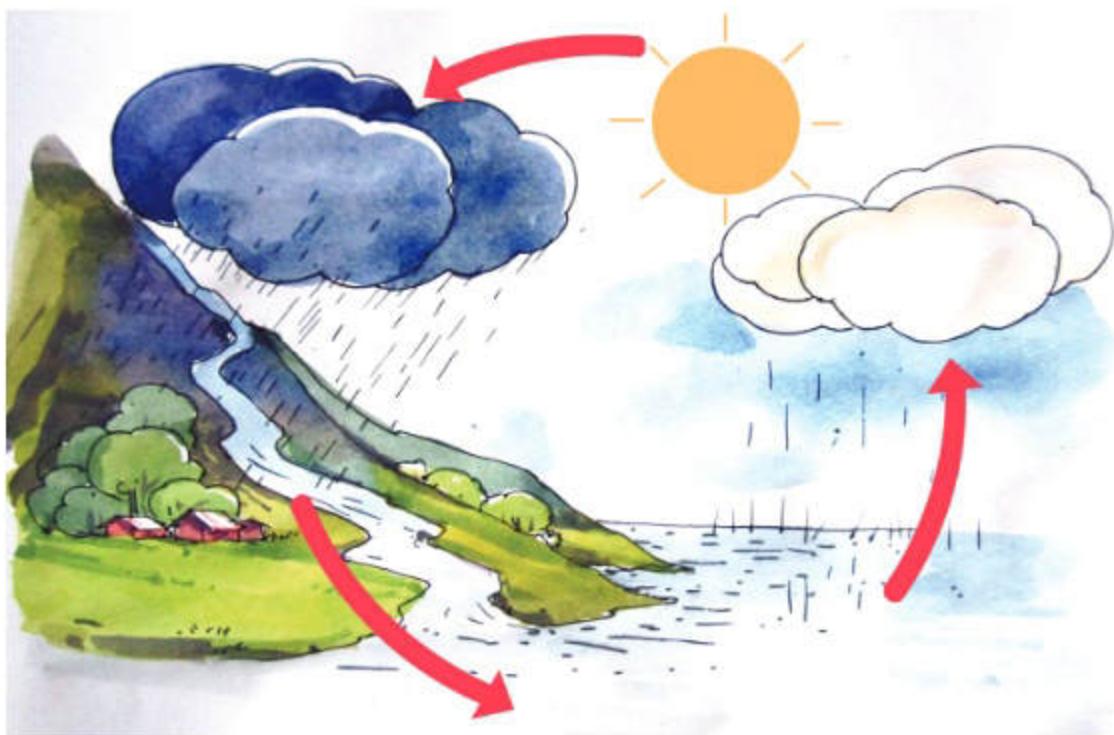
সূর্যোদয়ের দৃশ্য

আমরা জানি, পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া কোনো জীব বেঁচে থাকতে পারে না। পানি ছাড়া গাছপালাও বাঁচে না। প্রতিদিন আমাদের প্রচুর পানি ব্যবহার করতে হয়। এ পানি আমরা কোথা থেকে পাই?

প্রতিদিন সূর্যের তাপে নদীনালা, খালবিল ও সাগরের পানি জলীয় বাফ্ফে পরিণত হয়। এই জলীয় বাফ্ফ বাতাসে ভেসে বেড়ায়। পরে ঠাণ্ডা হলে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে। এই পানির কিছু অংশ মাটির নিচে জমা হয় আর কিছু অংশ পুরু, নদীনালা, খালবিল ও সাগরে গিয়ে পড়ে।

মাটির নিচে জমা পানি কৃপ ও নলকৃপের মাধ্যমে আমরা পাই। এ পানি বিশুদ্ধ পানি। বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। নদনদী, খালবিল এবং পুরুরের পানিও আমরা ব্যবহার করি। এসবের পানি যাতে বিশুদ্ধ থাকে, আমরা সেদিকে খেয়াল রাখব।

ভাবতে অবাক লাগে, পরম করুণাময় আল্লাহ পানিচর্ণের মাধ্যমে কেমন করে আমাদের প্রতিনিয়ত বিশুদ্ধ পানির জোগান দিয়ে চলেছেন। এ পানি, বৃষ্টি, নদীনালা, সাগর ও মহাসাগর সবই আল্লাহর দান।



চিত্র: পানিচক্র

আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে তোমরা ত্বেবে দেখেছ কি? এ পানি মেঘ থেকে তোমরাই নামিয়ে আন, না আমি তা বর্ণ করি?’

(সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত: ৬৮–৬৯)

আলো, বাতাস, পানি সবই আল্লাহ তায়ালার দান। আল্লাহই খাদ্য দেন। ছোট থেকে বড় করেন। সবার প্রয়োজন পূরণ করেন। অসংখ্য তাঁর অনুগ্রহ। তাঁর নিয়ামত গণনা করে শেষ করা যায় না। তাঁর নিয়ামত লাভ করেই আমরা বেঁচে আছি। তিনিই সারা বিশ্ব লালন-পালন করছেন। তিনিই নিখিল বিশ্বের পালনকর্তা।

চন্দ্র-সূর্য, পশু-পাখি, জীব-জঙ্গল, আলো-বাতাস, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, সাগর-মহাসাগর, আসমান-জমিন সবকিছু তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সব সৃষ্টিকে তিনি মানুষের আজ্ঞাবহ করে দিয়েছেন। আমরা আল্লাহর আদেশ মতো তাঁর সব নিয়ামত ভোগ করব। আর একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করব। তাঁরই শোকর আদায় করব।

أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - آল‌হামদু লিল্লাহি রাবিল আল‌মান

অর্থ: সব প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর, যিনি সারা বিশ্বের পালনকর্তা।

আল্লাহ আমাদের একমাত্র রব। আল্লাহ আমাদের পালনকর্তা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “যারা বলে, ‘আমাদের রব আল্লাহ’ এবং এর ওপর অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা তয় পেয়ো না, চিন্তিত হইও না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও”। (সূরা: হা-মিম সাজদাহ, আয়াত: ৩০)

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা পানিচক্রের একটি ছবি আঁকবে।

আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল (اللهُ عَفُورٌ)

মানুষ শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে অন্যায় করে ফেলে। পাপ কর্ম করে বসে। তখন যদি সে অনুত্তম হয়, ভুল স্বীকার করে, পাপ কাজ থেকে ফিরে আসে এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চায়, তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘হে আমার বশদাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হইও না। আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ (সূরা যুমার, আয়াত: ৫৩)

আমাদের ভুল হলে সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা চাইব। আল্লাহ আমাদের মাফ করে দেবেন। এরপর আমরা সাবধান থাকব, যেন আর কোনো ভুল না হয়।

আল্লাহ অতি সহনশীল (اللهُ حَلِيمٌ)

আমরা অনেক সময় অপরাধ করি। আল্লাহ আদেশ লঙ্ঘন করি। আল্লাহ তায়ালা সাথে সাথে শান্তি দেন না। আল্লাহ তায়ালা যদি আমাদের অপরাধের জন্য সাথে সাথে শান্তি দিতেন তাহলে আমরা কেউ বাঁচতে পারতাম না। আল্লাহ অতি সহনশীল। তিনি সহনশীলতা পছন্দ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاللهُ عَلَيْهِ حَلِيمٌ وয়াল্লাহু আলীমুন হালীম

অর্থ : আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, অতি সহনশীল। (সূরা নিসা, আয়াত: ১২)

আল্লাহ সর্বশ্রোতা (اللهُ سَمِيعٌ)

আল্লাহ সব শোনেন। আমরা প্রকাশে যা বলি, তা তিনি শোনেন। গোপনে যা বলি, তা-ও তিনি শোনেন। আমরা মনে মনে যা বলি, তা-ও তিনি শোনেন। তাঁর কাছে গোপন কিছুই নেই। আল্লাহ সর্বশ্রোতা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ . ইন্নাল্লাহ সামীউন আলিম

অর্থ: নিচ্যই আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন। (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮১)

আমরা অন্যায় কিছু বলব না। কারণ আল্লাহ তায়ালা শোনেন। আমরা কাউকে গালি দেব না, কারো বিরুদ্ধে ঘড়্যন্ত করব না। মিথ্যা কথা বলব না। ওয়াদা ভঙ্গ করব না। কখনো মিথ্যা সাক্ষ্য দেব না। কারণ মহান আল্লাহ সব জানেন, সব শোনেন।

আল্লাহ সর্বদৃষ্টা (اللهُ بَصِيرٌ)

আমরা অনেক কিছুই দেখি না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সবকিছু দেখেন। আমরা গোপনে যা করি, তা-ও তিনি দেখেন। প্রকাশে যা করি, তা-ও তিনি দেখেন। সাগরের তলদেশে, গভীর অন্ধকারে শুধু পোকার নড়াচড়াও তিনি দেখেন। তাঁর কাছে অদৃশ্য কিছুই নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ . ইন্নাল্লাহ সামীউন বাসির

অর্থ: নিচ্যই আল্লাহ সব শোনেন, সব দেখেন। (সূরা লোকমান, আয়াত: ২৮)

আমরা কর্তব্য কাজে অবহেলা করব না। কথা দিয়ে কথা ভঙ্গ করব না। অন্যায় কাজ করব না। কারো ওপরে অত্যাচার করব না। কারণ মহান আল্লাহ সব শোনেন, সব দেখেন।

আল্লাহ সর্বশক্তিমান (اللهُ قَدِيرٌ)

আমরা জানি, আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর শক্তির অধীন। আল্লাহ তায়ালা কারো ভালো করতে চাইলে কেউ তার ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ কারো ক্ষতি করতে চাইলে কেউ তা রোধ করতে পারে না। আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দেন।
 যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন।
 যাকে ইচ্ছা সম্মান দেন
 যাকে ইচ্ছা লাভ্যত করেন
 আর যাকে ইচ্ছা অফুরন্ত জীবিকা দান করেন।

আমরা জানলাম, আল্লাহ পালনকর্তা। আমরাও সৃষ্টজীবকে লালন-পালন করব।

আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল। আমরা ক্ষমা করতে শিখব। আল্লাহ অতি সহনশীল। আমরাও সহনশীল হব। ধৈর্য ধরব। আল্লাহ সব শোনেন। আমরা অন্যায় কথা কখনো বলব না। আল্লাহ সর্বশক্তিমান। আমরা ইমান রাখব জীবনের সুখ-দুঃখের মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ওপর।

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা আল্লাহ তায়ালার সাতটি গুণবাচক নামের তালিকা তৈরি করবে।

নবি-রাসূলের পরিচয়

তাওহিদের পর ইসলামের দ্বিতীয় মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে রিসালাত। রিসালাত অর্থ বার্তাবহন। যে ব্যক্তি একজনের কথা অন্যজনের কাছে নিয়ে পৌছায়, তাকে বলা হয় বার্তাবাহক বা রাসূল। কিন্তু ইসলামি পরিভাষায় যিনি আল্লাহর বাণী তাঁর বান্দাদের কাছে নিয়ে পৌছে দেন এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাদের সৎপথে পরিচালিত করেন, তাঁকে নবি বা রাসূল বলা হয়। নবি-রাসূলের কাজ বা দায়িত্বকে রিসালাত বলে।

আমরা জানি, যিনি গাড়ি তৈরি করেন তিনিই এর কলকজা সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখেন। কীভাবে গাড়ি চালালে ভালো থাকবে, দুর্ঘটনা ঘটবে না, তা তিনিই ভালো জানেন। সবাই তার কথামতো গাড়ি চালায়। তার কথামতো না চালালে গাড়ি দুর্ঘটনায় পতিত হয়। অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। মানুষ মারা যায়।

মানুষ, পৃথিবী ও আকাশের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তায়ালা। তিনিই সবকিছুর লালনপালন করেন। তিনিই জানেন কিসে রয়েছে মানুষের মজাল। কোন পথে চললে মানুষের সুখ হবে, শান্তি হবে, তাও তিনি জানেন। কীভাবে জীবনযাপন করলে দুঃখ থেকে বাঁচা যায়, কষ্ট থেকে বাঁচা যায়, তাও তিনি জানেন। তিনি মহাঙ্গানী। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জ্ঞান রাখেন।

কোন পথে মানুষের কল্যাণ, কোন পথে মানুষের সুখ, কোন পথে মানুষের ভবিষ্যৎ হবে মজালময়, কোন পথে রয়েছে মানুষের ক্ষতি—এসব বিষয় আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা পাঠালেন নবি ও রাসূল।

নবি-রাসূলগণ আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। তাঁরা নিষ্পাপ। আল্লাহর নিকট থেকে ওহির মাধমে তাঁরা জ্ঞান লাভ করতেন। ওহি মানে আল্লাহর বাণী। হ্যরত জিবরাইল (আ) ওহি নবি-রাসূলগণের কাছে নিয়ে আসতেন।

নবি-রাসূলগণের জীবনের লক্ষ্য ছিল মানুষের কল্যাণ সাধন করা। আর আল্লাহর অনুগত বাস্তা হিসেবে মানুষের জীবন গঠন করা। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর পথে, কল্যাণের পথে ডাকতে অনেক কষ্ট করেছেন। কিছুতেই তাঁরা থেমে যান নি। অবিচলভাবে কাজ করে গিয়েছেন।

নবি-রাসূলগণের মূল শিক্ষা ছিল :

১. তাওহিদ : আল্লাহ এক। তাঁর কেনো শরিক নেই।
২. রিসালাত : আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌছানো।
৩. দীন : আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষকে জানানো।
৪. আখলাক : চারিত্রিক গুণ ও ভালো ব্যবহারের নিয়ম-কানুন শিক্ষাদান।
৫. শরিয়ত : হালাল-হারাম ও জায়েজ-নাজায়েজের শিক্ষা প্রদান।
৬. আখিরাত : মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে জানানো।

পৃথিবীর প্রত্যেক এলাকার মানুষকে এই কথাগুলো শেখানোর জন্য নবি-রাসূলগণ এসেছেন। তাঁরা ছিলেন পথপ্রদর্শক।

আল্লাহ বলেন, وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَذِهِ الْوَيْسِيَّةُ الْمُبَارَكَةُ

অর্থ: প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছে সঠিক পথপ্রদর্শক।

(সূরা রাদ, আয়াত: ৭)

হযরত আদম (আ) থেকে আমাদের মহানবি (স) পর্যন্ত বহু নবি-রাসূল পৃথিবীতে এসেছেন। তাঁরা সকলেই আল্লাহর তাওহিদের কথা বলেছেন। তাঁর বিধানসমূহ মেনে চলতে আহ্বান জানিয়েছেন। কথায়, কাজে এবং আচার-ব্যবহারে তাঁরা ছিলেন আদর্শ ও চরিত্রবান। যারা তাঁদের আদর্শ গ্রহণ করেছে তারা নাজাত পেয়েছে। আল্লাহর রহমত লাভ করেছে। আর যারা তাঁদের বিরোধিতা করেছে, তাঁদের কথা মানেনি তারা হয়েছে ধৰ্ম।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবি। তাঁর পরে আর কোনো নবি আসেন নি। আসবেনও না। এজন্য তাঁকে বলা হয় খাতামান্নাবিয়টীন। খাতামান্নাবিয়টীন অর্থ সর্বশেষ নবি।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমানের নৈতিক উপকার সম্পর্কে একটি তালিকা তৈরি করবে।

আখিরাতের প্রতি ইমান

তৃতীয় যে বিষয়ের ওপর হযরত মুহাম্মদ (স) আমাদের ইমান আনতে নির্দেশ দিয়েছেন তা হচ্ছে আখিরাত।

প্রায় প্রতিদিনই আমরা বহু মানুষের মৃত্যুর সংবাদ শুনি। পাঢ়ার কেউ মারা গেলে আমরা খবর নিতে যাই। গোসল দিয়ে, কাফন পরিয়ে এক স্থানে জড়ে হয়ে মৃত ব্যক্তির জানায় পড়ি। দোয়া করি। পরে কবরে দাফন করি। পৃথিবীতে কিছুই অমর নয়। যার জন্ম আছে, তার মৃত্যুও আছে। কিন্তু মৃত্যুতেই সবকিছু শেষ হয়ে যায় না। মৃত্যুর পরও এক জগৎ আছে। মৃত্যুর পরবর্তী জগৎকে বলা হয় আখিরাত। আখিরাত অর্থ পরকাল।

মায়ের পেটে শিশু যেমন বুবাতে পারে না পৃথিবী কত বড়, কত সুন্দর; তেমনি মৃত্যুর আগে কেউ জানে না আখিরাত কত বিরাট এক জগৎ। আখিরাত সম্পর্কে নবি-রাসূলগণ ওহির মাধ্যমে জ্ঞান পেয়েছেন। নবিগণ ছিলেন সত্যবাদী এবং আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। তাঁদের কাছ থেকেই আমরা আখিরাত সম্পর্কে জ্ঞান পেয়েছি।

হযরত আদম (আ) থেকে শেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত সব নবি-রাসূলই

বলেছেন আখিরাতের কথা। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের কথা। মৃত্যুর পরের জীবন অনন্তকালের জীবন। সে জীবনের শেষ নেই।

আখিরাত সংক্রান্ত যে বিষয়ের উপর ইমান আনা জরুরি তা হলো:

১. কবরে সওয়াল – জওয়াব।
২. কবরে আরাম অথবা আজাব।
৩. এক দিন আল্লাহ তায়ালা সমগ্র বিশ্বজগৎ ও তার ভেতর সৃষ্টিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। এ দিনটির নাম হলো কিয়ামত।
৪. আবার তাদের সবাইকে দেওয়া হবে নতুন জীবন এবং তারা সবাই এসে হাজির হবে আল্লাহর সামনে। একে বলা হয় হাশর।
৫. সকল মানুষ তাদের পার্থিব জীবনে যা করেছে তার আমলনামা আল্লাহর আদালতে পেশ করা হবে।
৬. আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক ব্যক্তির ভালোমন্দ কাজের পরিমাপ করবেন। আল্লাহর মিয়ানে যার সৎকর্মের পরিমাপ অসং কর্ম অপেক্ষা বেশি হবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে মাফ করবেন। আর যার অসং কর্মের পাল্লা ভারি থাকবে, আল্লাহ তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন।
৭. আল্লাহর কাছ থেকে যারা ক্ষমা লাভ করবে তারা জাল্লাতে চলে যাবে। আর যাদের শাস্তি দেবেন তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

কবরে সওয়াল-জওয়াব

সওয়াল-জওয়াব অর্থ প্রশ্ন এবং উত্তর। মৃত্যুর পর প্রত্যেক মানুষকেই সওয়াল-জওয়াবের সম্মুখীন হতে হবে। কবরে দুইজন ফেরেশতা আসেন এবং মৃত ব্যক্তিকে তিনটি প্রশ্ন করেন।

১. مَنْ رَبُّكَ

তোমার রব কে?

২. মা দীনুকা مَادِينْكَ

অর্থ : তোমার দীন কী?

৩. মহানবি (স) কে দেখিয়ে বলা হবে :

মান হায়ার রাজুল؟ مَنْ هُذَا الرَّجُلُ অর্থ: এই ব্যক্তি কে?

মহানবি (স) আমাদের এগুলোর সঠিক উত্তর শিখিয়ে দিয়েছেন।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হলো :

رَبِّيْ اللَّهُ - رَبِّি আল্লাহ। অর্থ : আমার রব আল্লাহ।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হলো :

دِيْنِيْ إِسْلَامُ دِيْনী আল ইসলাম। অর্থ : আমার দীন ইসলাম।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর হলো :

هَذَا رَسُولُ اللَّهِ - হায়া রাসুলুল্লাহ। অর্থ : ইনি আল্লাহর রাসুল।

পৃথিবীতে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কথামতো চলছে, তারা সবাই এ প্রশংগুলোর ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারবে। তারা হবে সফলকাম। কিন্তু যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কথামতো চলত না, তারা সঠিক উত্তর দিতে পারবে না। আফসোস করে বলবে, হায়! আমি তো কিছু জানি না।

কবরে আরাম অথবা আজাব

কবর হলো আধিরাতের প্রথম ধাপ। পৃথিবীতে যারা পাপ কাজ থেকে বিরত রয়েছে, তারা কবরের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে। তাদের জন্য কবর হবে আরাম ও শান্তিময় স্থান। জান্নাতের সাথে তাদের যোগাযোগ করে দেওয়া হবে। সেখানে তারা জান্নাতের শান্তি অনুভব করবে।

আর যারা পাপী, তারা সঠিক উত্তর দিতে পারবে না। তাদের জন্য কবর হবে আজাবের স্থান। আজাব অর্থ শান্তি। জাহানামের সাথে তাদের কবরের যোগাযোগ করে দেওয়া হবে। সেখানে তারা ভীষণ আজাব ভোগ করবে। আমরা পাপ কাজ থেকে বিরত থাকব। আল্লাহ তায়ালা আমাদের কবরের আজাব থেকে রক্ষা করবেন।

কিয়ামত (الْقِيَامَةُ)

এমন একদিন ছিল যখন এই নিখিল বিশ্ব এবং এর কোনো কিছুই ছিল না। আল্লাহ তায়ালা তাঁর মহান কুদরতে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আবার মানুষের অবাধ্যতা যখন চরমে পৌছাবে, আল্লাহর নাম নেওয়ার মতো একটি লোকও থাকবে না, সেদিন আল্লাহ এই বিশ্বজগৎ এবং এর সবকিছু ধ্বংস করে দেবেন। একেই বলে কিয়ামত। বিশ্বজগতের এরূপ পরিণতি বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন। তাঁরা বলেন, এমন এক সময় আসবে যখন সূর্য শীতল হয়ে যাবে, চাঁদের আলো থাকবে না। গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটবে। পৃথিবী এবং এর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

হাশর (الحَشْرُ)

বিশ্বজগৎ ধ্বংস হওয়ার অনেক বছর পর আল্লাহ তায়ালা সবাইকে পাপ-পুণ্যের বিচারের জন্য পুনরায় জীবিত করবেন। সবাইকে সেদিন আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে। একে বলা হয় হাশর। এদিন আমাদের সব কথা ও কাজের হিসাব দিতে হবে। যারা মুমিন এবং যারা পৃথিবীতে ভালো কাজ করেছে, তারা সেদিন আল্লাহর অনুগ্রহ পাবে। তারা নিরাপদে থাকবে। আর যারা ইমান আনে নি, ভালো কাজ করে নি, তারা ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হবে। তাদের কফ্টের সীমা থাকবে না।

মিয়ান (الْمِيزَانُ)

আমরা যা করি, যা বলি, আল্লাহ সবই সংরক্ষণ করেন। আমাদের চলাফেরা, আচার-আচরণ, ভালোমন্দ, পাপ-পুণ্য সবকিছু লিখে রাখা হয়। একে বলা হয় আমলনামা। আল্লাহর হুকুমে একদল ফেরেশতা সবকিছু লিখে রাখেন। এই ফেরেশতাদের বলা হয় কেরামান কাতেবিন। হাশরের দিন আমাদের পাপ ও পুণ্যের আমলনামা ওজন করা হবে। যার দ্বারা ওজন করা হবে তাকে বলে মিয়ান। মিয়ান অর্থ পরিমাপযন্ত। ওজনে যাদের নেক কাজ বেশি হবে তারা হবে জান্নাতের অধিকারী। যাদের পাপ বেশি হবে তারা হবে জাহানামী।

জান্নাত ও জাহানাম

জান্নাত হলো চিরস্থায়ী সুখের স্থান। সেখানে কেবল শান্তি আর শান্তি। আনন্দ আর আনন্দ। পৃথিবীতে যারা ছিল ইমানদার, যারা ছিল ভালো, তারা চিরদিনের জন্য সেখানে বাস করবে। জান্নাতে আছে আরামের সব রকমের ব্যবস্থা। মন যা চাইবে সেখানে তাই পাওয়া যাবে। সেখানে আছে উন্নত খাদ্য, পানীয় এবং সুন্দর বাগান ও ফলফলাদি।

সেখানে কোনো অভাব নেই, অশাস্তি নেই, কোনো দুঃখ-বেদনাও নেই।

জাহানাম হলো চিরস্থায়ী ক্ষেত্রের স্থান। পৃথিবীতে যারা ইমান আনে নি, ভালো কাজ করে নি, তারা সেখানে চিরদিন বাস করবে।

জাহানামে কেবল দুঃখ আর দুঃখ। সেখানে আছে ভীষণ ও ভয়ংকর শাস্তি। যেমন আগুনে পোড়ানো, সাপের দংশন, আরো নানা রকম শাস্তি।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা আধিরাতের জীবনের স্তরগুলো উল্লেখ করে এর একটি তালিকা তৈরি করবে।

আধিরাতে বিশ্বাসের নেতৃত্বকার

আধিরাত সম্পর্কে হ্যারত মুহাম্মদ (স) যা শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁর আগেকার নবিগণও ঠিক তাই বলেছেন। আধিরাত ব্যাপারটি ভালো করে চিন্তা করলে বুবাতে পারা যায় যে, আধিরাতের স্বীকৃতি ও অঙ্গীকৃতি মানুষের জীবনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে।

আধিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি আল্লাহর পথে গরিবকে যাকাত দেন। তিনি মনে করেন না, এতে তাঁর সম্পত্তি কমে যাবে। তিনি সবসময় সত্য কথা বলেন এবং মিথ্যা থেকে বিরত থাকেন। কুড়িয়ে পাওয়া কোনো মূল্যবান বস্তু পেলে তিনি মনে করেন, এ বস্তু তাঁর নয়। এটি তিনি গ্রহণ করতে পারেন না।

সোজা কথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম তাঁকে এক বিশেষ পথে চলার নির্দেশ দেয়। কেননা ইসলামে প্রতিটি জিনিসের মূল্য নির্ধারিত হয় আধিরাতের ফলাফলের ওপর। কিন্তু আধিরাতে অবিশ্বাসী ব্যক্তি প্রত্যেক ব্যাপারে ইহকালের ফলাফলের উপর গুরুত্ব দেয়।

একজন মুসলিমের চরিত্র

মুসলিম চরিত্রে থাকবে আল্লাহ তায়ালার ভয়। সবকিছুর মালিক আল্লাহ তায়ালা-এ ধারণা নিয়ে পৃথিবীতে সে বাস করবে। সারা পৃথিবীর মানুষের দখলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর দান। কোনো জিনিসের এমনকি আমার নিজের দেহের মালিকও আমি নিজে নই। সবকিছু আল্লাহ তায়ালার দেওয়া আমানত। এ আমানত থেকে খরচ করার যে স্বাধীনতা আমাকে দেওয়া হয়েছে, আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তা খরচ করাই হলো আমার কর্তব্য। একদিন আল্লাহ তায়ালা আমার কাছ থেকে এ আমানত ফেরত নেবেন। কিয়ামতের দিন আমাকে প্রত্যেকটি জিনিসের হিসাব দিতে হবে।

এ ধারণা নিয়ে যে ব্যক্তি বেঁচে থাকে, তার চরিত্র হবে সুন্দর। মন্দ চিন্তা থেকে সে তার মনকে মুক্ত রাখবে। কানকে দূরে রাখবে অসৎ আলোচনা শোনা থেকে। কারোর প্রতি কুদৃষ্টি দেওয়া থেকে চোখকে হেফাজত করবে। মিথ্যা কথা বলা থেকে জিহ্বাকে হেফাজত করবে। হারাম জিনিস দিয়ে সে পেট ভরবে না। সে না খেয়ে থাকবে তবুও কারোর প্রতি সে জুলুম করবে না। সে কখনো অন্যায়ের পথে তার পা বাঢ়াবে না। মিথ্যার সামনে সে তার মাথা নত করবে না। তার চরিত্রে থাকবে সততা ও মহত্বের সমাবেশ। সত্য ও ন্যায়কে পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয় মনে করবে। জুলুম ও অন্যায়কে সে ঘৃণা করবে। এ শ্রেণির লোকই সাফল্য অর্জন করতে পারে। যার অন্তরে আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় স্থান পায় না, আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে সে পুরস্কার চায় না, তার চেয়ে বড় ইমানদার আর কে? কোন শক্তি তাকে বিচ্যুত করতে পারে সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে? কোন সম্পদ ক্রয় করতে পারে তার ইমানকে?

তার চেয়ে বেশি বিশ্বস্ত পৃথিবীতে আর কেউ হতে পারে না। কারণ সে কারোর আমানত বিনষ্ট করে না। ন্যায়ের পথ থেকে সে মুখ ফেরায় না। কথা দিয়ে কথা রাখে, ভালো ব্যবহার করে। আর কেউ দেখুক আর না দেখুক, আল্লাহ তো সব কিছুই দেখছেন - এ ধারণা নিয়ে সে সবকিছুই করে ইমানদারির সাথে। এমন লোককে সবাই দেখে করে, সম্মান দেয়। এমনি করে পৃথিবীতে ইজ্জত ও সম্মানের সাথে জীবন অতিবাহিত করে যখন সে আল্লাহর সামনে হাজির হবে, তখন তার উপর বর্ষিত হবে আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ ও রহমত। এ হলো মহাসাফল্য।

দলীয় কাজ

শিক্ষার্থীরা দলে বসে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করে একজন মুসলিমের চরিত্র কেমন হবে এর একটি তালিকা তৈরি করে মার্কার দিয়ে পোস্টার পেপারে লিখবে। সবচেয়ে ভালো তালিকাটি শ্রেণিকক্ষে ঝুলিয়ে রাখবে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন(✓) দাও।

১. আমাদের পালনকর্তা কে?

ক) আকবা-আম্মা

খ) আল্লাহ তায়ালা

গ) ডাক্তার

ঘ) পীরমুশিদ ।

২. আল আসমাউল হুসনা বলা হয় কাকে?

ক) মানুষের গুণাবলিকে

খ) ফেরেশতার গুণাবলিকে

গ) আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহকে

ঘ) নবিগণের গুণাবলিকে ।

৩. ‘খালিক’ শব্দের অর্থ কী?

ক) পালনকর্তা

খ) সৃষ্টিকর্তা

গ) রিজিকদাতা

ঘ) দয়ালু ।

৪. ‘বাসিরুন’ শব্দের অর্থ কী?

ক) সর্বশ্রোতা

খ) সহনশীল

গ) সর্বশক্তিমান

ঘ) সর্বদ্রষ্টা ।

৫. ‘সামীউন’ শব্দের অর্থ কী?

ক) সব শোনেন

খ) সব জানেন

গ) সব দেখেন

ঘ) অতিসহনশীল ।

৬. সর্বশেষ নবির নাম কী?

ক) হ্যরত ইউসুফ (আ)

খ) হ্যরত ইসা (আ)

গ) হ্যরত মুহাম্মদ (স)

ঘ) হ্যরত মুসা (আ) ।

৭. ‘কাদীরুন’ শব্দের অর্থ কী?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ক) সর্বশক্তিমান | খ) সর্বশ্রোতা |
| গ) সর্বদ্রষ্টা | ঘ) সৃষ্টিকর্তা। |

৮. শূন্যস্থান পূরণ কর:

১. আনুগত্যের জন্য প্রয়োজন।
২. আল্লাহ তায়ালার গুণে গুণান্বিত করতে হবে।
৩. আল্লাহ তায়ালা আমাদের।
৪. আমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার করব।
৫. আমরা কথা দিয়ে কথা।

গ. ডান পাশের সঠিক শব্দগুলো দিয়ে বাম পাশের শব্দগুলোর সাথে মিল কর।

বাম	ডান
১. গাফুরুন অর্থ	অতি সহনশীল
২. হালিমুন অর্থ	অতি ক্ষমাশীল
৩. রাসুল অর্থ	চিরস্থায়ী সুখের স্থান
৪. জান্নাত হলো	চিরস্থায়ী ক্ষেত্রের স্থান
৫. জাহান্নাম অর্থ	বার্তাবাহক

ঘ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন:

১. ‘ইমান’ শব্দের অর্থ কী?
২. সারা বিশ্বের পালনকর্তা কে?
৩. আমাদের দীনের নাম কী?

৪. আমরা কী বলে আল্লাহর শোকর আদায় করব?
৫. ‘আখিরাত’ মানে কী?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে জানা ও ইমান আনার জন্য আমাদের কী কী জানা জরুরি?
২. মুনিন কাকে বলে? ইমানের ফল কী?
৩. সারা বিশ্বের পালনকর্তা কে? তাঁর লালন-পালনের একটি বর্ণনা দাও।
৪. আল্লাহ তায়ালার ৫টি গুণের নাম বাংলা অর্থসহ আরবিতে লেখ।
৫. আল্লাহ ক্ষমাশীল তা বুঝিয়ে লেখ।
৬. নবি-রাসূলগণের শিক্ষার মূল কথাগুলো কী কী?
৭. আখিরাত জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কী কী?
৮. একজন মুসলিমের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত-এ সম্পর্কে ১০টি বাক্য লেখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদত (ﺍِبَادَة)

‘ইবাদত’ শব্দের অর্থ আনুগত্য, দাসত্ব, বলে গি ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য স্থির করে তাঁর যাবতীয় আদেশ, নিষেধ মেনে চলাকে বলে ইবাদত। আল্লাহ আমাদের ‘ইলাহ’। ইলাহ মানে মাঝুদ। আর আমরা তাঁর আবদ। আবদ মানে অনুগত বাস্তু। আমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ তায়ালা যেসব কাজ করলে খুশি হন, যা যা করতে বলেছেন তা করা, আর যা যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ মেনে চলাই ইবাদত।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের লালন-পালন করেন। তিনিই আমাদের রব। আমাদের জীবন-মৃত্যুর মালিকও তিনিই। তিনি এই মহাবিশ্বকে আমাদের জন্য কতো সুন্দর করে সজিয়েছেন। আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, ফল-ফসল, গাছ-পালা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত সবকিছুই আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি সবকিছুকে আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। আর তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁরই ইবাদতের জন্য। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- ‘আর আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি’। (সূরা যারিয়াত, আয়াত: ৫৬)

আমাদের জন্য কতগুলো নির্ধারিত মৌলিক ইবাদত রয়েছে। যেমন- সালাত, সাওম, হজ, যাকাত, সাদাকাহ, দান-খয়রাত ও আল্লাহর পথে জিহাদ ইত্যাদি। এগুলো মহানবি (স) যেভাবে আদায় করেছেন, আমাদের যেভাবে আদায় করতে বলেছেন, আমরা ঠিক সেভাবেই আদায় করব।

ইবাদত শুধু সালাত, সাওম ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য রাসূল (স) এর দেখানো পথে যে কোনো ভালো কাজই ইবাদতের মধ্যে শামিল। ভালো কাজের উৎসাহ দেওয়াও ইবাদত। রাসূল (স) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের

পরামর্শ দেয়, সে ব্যক্তিও কাজটি সম্পাদনকারীর সমান পুরস্কার পাবে।' (মুসলিম)

আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইবাদতের জন্যই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমাদের সব সময়ই তাঁর ইবাদতে মশগুল থাকা কর্তব্য। প্রশ্ন উঠতে পারে, সব সময়ই কি ইবাদতে মশগুল থাকা সম্ভব? হ্যাঁ, দিন-রাত চবিশ ঘণ্টা ইবাদত করা সম্ভব। যেমন আমরা যদি বিসমিল্লাহ বলে হালাল খাদ্য খাই, খাওয়ার পরে শোকর করি তবে খাওয়ার সময়টুকু ইবাদতে গণ্য হবে।

পড়ার সময় বিসমিল্লাহ বলে পড়া শুরু করলে যতক্ষণ লেখাপড়া করব, ততক্ষণই ইবাদতে গণ্য হবে। বিসমিল্লাহ বলে স্ফূলে যাত্রা শুরু করলে আল্লাহ তায়ালা আমাদের রাস্তার বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবেন।

কোনো অন্ধ লোককে রাস্তা পার হতে সাহায্য করলে আল্লাহর নিকট এর পুরস্কার পাওয়া যাবে, এটিও ইবাদত। রাস্তার ময়লা, আবর্জনা বা কষ্টদায়ক কোনো বস্তু অপসারণ করাও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

সৎপথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা, চাষাবাদ এবং অন্য কোনো সৎ পেশায় নিয়োজিত হয়ে যথাযথ কর্তব্য পালন করাও ইবাদতের মধ্যে শামিল। এমনকি ঘুমানোর আগে পাক-পবিত্র হয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে ঘুমালে নিদ্রার সময়টুকুও আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে গণ্য। এভাবে আমরা সর্বক্ষণই আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতে পারি।

ইবাদতে আল্লাহ তায়ালা খুশি হন। এতে দুনিয়ার জীবন সুখের হয়। পরকালে পরম শান্তিময় স্থান জান্নাত লাভ করা যায়। আর যারা ইবাদত করে না, আল্লাহর পথে চলে না, আল্লাহ তাদের প্রতি অস্তুষ্ট হন। তারা দুনিয়াতে শান্তি পায় না। পরকালে তাদের জাহান্নামের কঠিন শান্তি ভোগ করতে হবে।

আমরা আন্তরিকতার সাথে ইবাদত পালন করব। আমাদের জীবন সর্বক্ষণই যাতে আল্লাহর ইবাদতে গণ্য হয় সে চেষ্টা অব্যাহত রাখব।

পাক-পবিত্রতা (پاکیتھے)

আল্লাহর ইবাদতের জন্য পাক-পবিত্র থাকা প্রয়োজন। শরীর, পোশাক এবং স্থান বা পরিবেশ পাকসাফ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে মনও পবিত্র থাকে। মন পবিত্র থাকলে মনে শান্তি লাগে, ভালো কাজ করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। অপবিত্র মন শয়তানের কারখানা। পাকসাফ না হয়ে সালাত আদায় করা যায় না।

দেহ, মন, পোশাক, স্থান বা পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা ও নির্মলতাকে তাহারাত বা পবিত্রতা বলে। ওয়, গোসল, তায়াম্মুমের মাধ্যমে শরীর পবিত্র করা হয়। কাপড়-চোপড় ও পোশাক ধুয়ে পাকসাফ করা হয়। ময়লা-আবর্জনা ও নোংরা দূর করে পরিবেশ পাকসাফ করা হয়।

সালাত আদায়ের জন্য শরীর ও পোশাকের মতো স্থান বা পরিবেশ পবিত্র হওয়াও প্রয়োজন। অপবিত্র স্থানে সালাত আদায় করা যায় না। পরিবেশ পবিত্র না থাকলে শরীর ও পোশাক পবিত্র রাখা যায় না। আবার তায়াম্মুম করার জন্য পবিত্র মাটি বা মাটি জাতীয় পদার্থ প্রয়োজন। সুতরাং আমাদের শরীর, পোশাক, পানি, মাটিসহ গোটা পরিবেশ পাক সাফ রাখা প্রয়োজন। আমরা সব সময় শরীর, পোশাক ও পরিবেশ পাকসাফ রাখব। সব সময় পাকসাফ থাকার অভ্যাস গড়ে তুলব।

সালাত (الصَّلَاةُ)

আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইবাদত করার জন্যই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। ইবাদত অর্থ আনুগত্য করা। আল্লাহ তায়ালার নিকট বাস্তুর আনুগত্য প্রকাশের যত মাধ্যম বা পদ্ধা আছে তার মধ্যে সালাত হলো সর্বশ্রেষ্ঠ। সালাতের মাধ্যমেই আল্লাহর প্রতি বাস্তুর চরম আনুগত্য প্রকাশ পায়।

সালাত শব্দের অর্থ নত হওয়া, বিনয়-বিন্দু হওয়া, দোয়া করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, দরুদ পড়া। ইসলামের পরিভাষায় আহকাম, আরকানসহ বিশেষ নিয়মে আল্লাহর ইবাদত করাকে সালাত বলে। সালাতকে নামাজও বলে।

ইসলাম পাঁচটি রুকনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। রুকন মানে খুঁটি। পাঁচটি রুকন হলো:

১. ইমান, ২. সালাত, ৩. সাওম, ৪. হজ, ও ৫. যাকাত।

ইমানের পরেই সালাতের স্থান। সালাত সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। রাসূল (স) বলেছেন, **أَصَلُّهُ عِمَادُ الدِّينِ**

অর্থ: “সালাত দীন বা ইসলামের খুঁটি” (বায়হাকী)

যে সালাত কায়েম করলো, সে দীনরূপ ইমারতটি কায়েম রাখল। আর যে সালাত ত্যাগ করল, সে দীনরূপ ইমারতটি ধ্বংস করল। কুরআন মজিদে বার বার সালাত কায়েমের হুকুম দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে: **أَقِمِ الصَّلَاةَ**

অর্থ: “সালাত কায়েম করো।” (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ৭৮)

দিন-রাত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জীবনের প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালার কথা অরণ করিয়ে দেয়। বাস্দার মনে আল্লাহর বিধানমতো চলার অনুপ্রেরণা জোগায়। সালাতের মাধ্যমে বাস্দা আল্লাহ তায়ালার বেশি নৈকট্য লাভ করতে পারে।

সালাতের মাধ্যমে মানুষ নিষ্পাপ হয়ে যায়। রাসূল (স) একদিন সাহাবিদের বললেন, “তোমাদের বাড়ির সামনে যদি একটি নদী থাকে, আর কোনো ব্যক্তি যদি ঐ নদীতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তবে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে? সাহাবিরা বললেন, না। কোনো ময়লা থাকতে পারে না। তখন রাসূল (স) বললেন, ঠিক তেমনি কোনো বাস্দা যদি প্রতিদিন পাঁচবার সালাত আদায় করে তার আর কোনো গুনাহ থাকতে পারে না।” – বুখারি ও মুসলিম।

রাসূল (স) আরও বলেছেন, **কোনো বাস্দা জামাআতের সাথে সালাত আদায় করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে পাঁচটি পুরকার দিবেন।**

১. তার জীবিকার অভাব দ্রু করবেন।
২. কবরের আজাব থেকে মুক্তি দেবেন।
৩. হাশরে আমলনামা ডান হাতে দেবেন।
৪. পুলসিরাত বিজলীর মতো দ্রুত পার করবেন।
৫. তাকে বিনা হিসাবে জান্নাত দান করবেন।

জান্নাত লাভ করতে হলে নিয়মিত সালাত আদায় করতে হবে। মহানবি (স) বলেছেন,

مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الْصَّلَاةُ

“সালাত জান্নাতের চাবি।” (তিরমিজি, আহমাদ)।

রাসুলুল্লাহ (স) আরও বলেছেন, ‘কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেওয়া হবে। যার সালাতের হিসাব সঠিক হবে তার অন্য সব হিসাবও ঠিক হবে। আর যার সালাতের হিসাব গরমিল হবে, তার অন্যসব হিসাবও গরমিল হবে।’ (তাবারানি)

একাকী সালাত আদায়ের চেয়ে সকলে মিলে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করলে বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে মুসলিমগণ দৈনিক পাঁচবার মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়, পরস্পরের খৌজখবর নিতে পারে। একতা, ভাতৃত্ব সৃষ্টি হয়। পরস্পরে সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। সুখে-দুঃখে একে অন্যের সাহায্য করতে পারে। সালাত মানুষের চরিত্র সংশোধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সালাত মানুষকে সব রকম অশ্রীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘নিশ্চয়ই সালাত অশ্রীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।’
(সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৪৫)

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা পাঁচটি মৌলিক ইবাদতের নাম খাতায় লিখবে।

সালাতের সময় (أوقات الصلاة)

সময়মতো সালাত আদায় করা আল্লাহর হুকুম। যথাসময়ে সালাত আদায় না করলে আদায় হয় না।
এ সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘নিশ্চয়ই সঠিক সময়ে সালাত কার্যে করা মুমিনের

জন্য ফরজ'। (সূরা আন নিসা, আয়াত: ১০৩)

রাসূল(স)-এর কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আল্লাহর কাছে কোন আমলটি উত্তম? তিনি উত্তরে বললেন, সময়মতো সালাত আদায় করা। (বুখারি, মুসলিম)

সালাত আদায়ের সময় সম্পর্কে আমাদের ভাগোভাবে জেনে নিতে হবে। নিম্নে সালাতের ওয়াক্তের বিবরণ দেওয়া হলো:

১. **ফজর :** ফজর সালাতের সময় শুরু হয় সূবহে সাদিক হওয়ার সাথে সাথে এবং সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এর সময় থাকে। রাতের শেষে আকাশের পূর্ব দিগন্তে লম্বা আকৃতির যে আলোর রেখা দেখা যায় তাকেই বলে সূবহে সাদিক।
২. **যোহর :** দুপুরের সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়লেই যোহরের ওয়াক্ত শুরু হয়। ছায়া আসলি বাদে কোনো বস্তুর ছায়া দিগুণ হওয়া পর্যন্ত এর সময় থাকে। কোনো বস্তুর ঠিক দুপুরের সময় যে ক্ষুদ্র ছায়া থাকে তাকেই বলে ছায়া আসল ছায়া।
৩. **আসর :** যোহরের সময় শেষ হলেই আসরের সময় শুরু হয় এবং সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। তবে সূর্যের রং হলুদ হওয়ার আগেই আসর সালাত আদায় করতে হয়।
৪. **মাগরিব :** সূর্যাস্তের পর থেকে মাগরিবের সময় শুরু হয় এবং পশ্চিম আকাশে যতক্ষণ লালিমা বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ সময় থাকে।
৫. **এশা :** মাগরিবের সময় শেষ হলেই এশার সালাতের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। তবে মধ্য রাতের আগেই আদায় করা উত্তম।

এশার সালাত আদায়ের পরে বিতর সালাত আদায় করতে হয়।

সালাতের নিষেধ সময়

রাসূল (স) তিনি সময়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন :

১. ঠিক সুর্যোদয়ের সময়
২. ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়
৩. সূর্যাস্তের সময়।

তবে যুক্তিসংগত কোনো কারণে ঐদিনের আসরের সালাত আদায় না করা হলে তা এই সময় আদায় করা যাবে।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়ের শুরু ও শেষসহ খাতায় একটি চার্ট তৈরি করবে।

আমরা প্রতিদিন নিয়মিত যে সালাত আদায় করি তা নিচের ছকে দেখানো হলো—

ওয়াক্ত	সুন্নত (মুয়াকাদাহ)	ফরজ	সুন্নত (মুয়াকাদাহ)	ওয়াজিব
ফজর	২ রাকআত	২ রাকআত		
যোহর	৪ রাকআত	৪ রাকআত	২ রাকআত	
আসর		৪ রাকআত		
মাগরিব		৩ রাকআত	২ রাকআত	
এশা		৪ রাকআত	২ রাকআত	৩ রাকআত (বিতর সালাত)

ছকে বর্ণিত নিয়মিত সালাত ছাড়াও আরও কিছু সুন্নত ও নফল সালাত আছে, যা আমরা পরে জানব।

পরিকল্পিত কাজ : কোন ওয়াক্তে কত রাকআত ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত সালাত আছে

শিক্ষার্থীরা তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

সালাত আদায়ের নিয়ম

সব কাজেরই নিয়ম-পদ্ধতি আছে। নিয়মমতো কাজ করলে সুফল পাওয়া যায়। সালাত একটি বড় ইবাদত। সালাত আদায়েরও নিয়ম-পদ্ধতি আছে। মহানবি (স) নিজে সালাত আদায় করে সাহাবিগণকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ, তোমরাও সেভাবে সালাত আদায় করবে।’

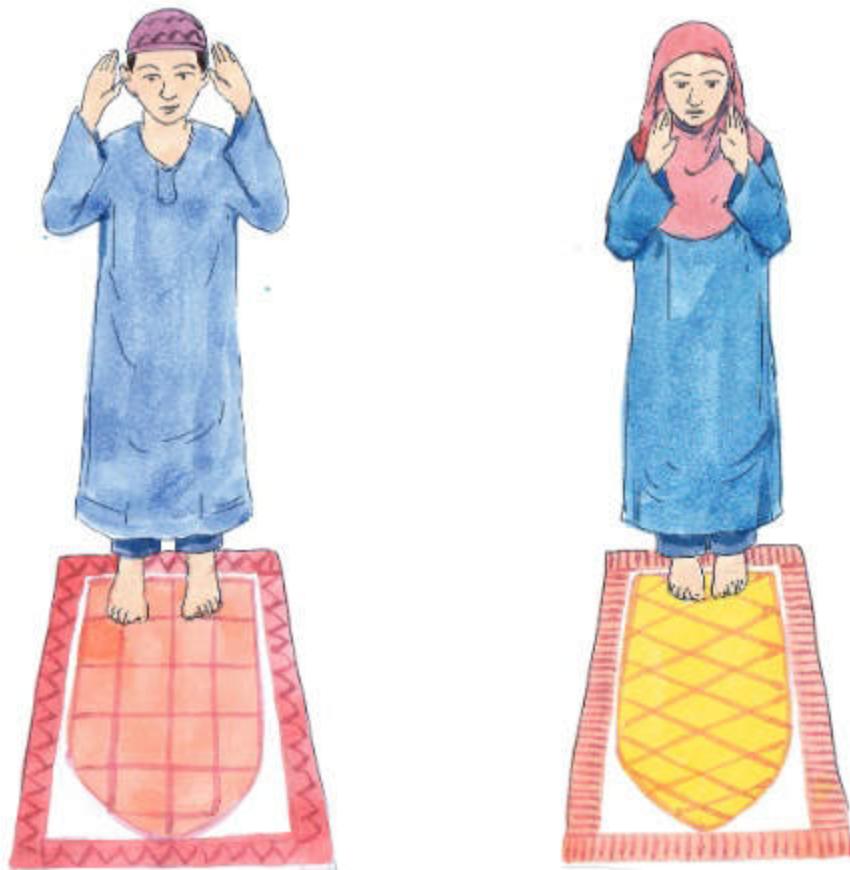
মহানবি (স)-এর শেখানো নিয়মে সালাত আদায় করতে হবে।

সালাতের সময় হলে আমরা পাক-পবিত্র হয়ে, পাকসাফ কাপড় পরব। তারপর পবিত্র জায়গায় কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াব। মনে করতে হবে আমি আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, তিনি আমাকে দেখছেন। তিনি আমার অন্তরের খবরও রাখছেন।



সালাতে দাঁড়ানোর সঠিক পদ্ধতি

সালাতের নিয়ত করে আল্লাহু আকবর বলব। একে বলে তাকবিরে তাহরিমা।



তাকবিরে তাহরিমা : হাত তোলার দৃশ্য

তাকবিরের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা দুই হাত কান বরাবর ওঠাবে। এরপর দুই হাত নাভির ওপর বাঁধবে। মেয়েরা দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত ওঠাবে। মেয়েরা হাত বাঁধবে বুকের ওপর।

হাত বাঁধার নিয়ম

বাম হাতের তালু নাভির ওপর রাখব। আর ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের ওপর

রেখে কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা বাম হাতের কবজি ধরব। মাঝের ৩টি আঙ্গুল বাম হাতের কবজির উপর বিছিয়ে রাখব। মেঘেরা শুধু বাম হাতের উপর ডান হাত রাখবে।



সালাতে সঠিক পদ্ধতিতে হাত বাঁধা অবস্থা

এরপর সানা পড়ব। সানা হলো:

سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

বাঢ়া উচ্চারণ: সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা, ওয়া তাআলা জাদুকা, ওয়া লা ইলাহা গাহিরুকা।

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমি তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তোমার জন্যই সকল

প্রশংসা। তোমার নাম বরকত ও কল্যাণময়। তোমার সম্মান অতি উচ্চে। তুমি ছাড়া আর কোনো মারুদ নেই।'

এরপর আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম পড়ে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পড়ব। পরে সূরা ফাতিহা পাঠ করে অন্য কোনো সূরা বা তার অংশ পাঠ করব। আয়াত ছোটো হলে কমপক্ষে তিন আয়াত এবং বড়ো হলে কমপক্ষে এক আয়াত পাঠ করবো। তারপর আল্লাহু আকবার বলে রুকু করব। রুকুতে অন্তত তিনবার ‘সুবহানা রাকবিয়াল আজিম’ পড়ব।

রুকু করার নিয়ম

রুকুতে দুই হাত দুই ইঁটুর উপর এমনভাবে রাখতে হবে যাতে মাথা, পিঠ ও কোমর এক বরাবর হয়। কনুই পাঁজর থেকে ফাঁক করে রাখতে হবে।



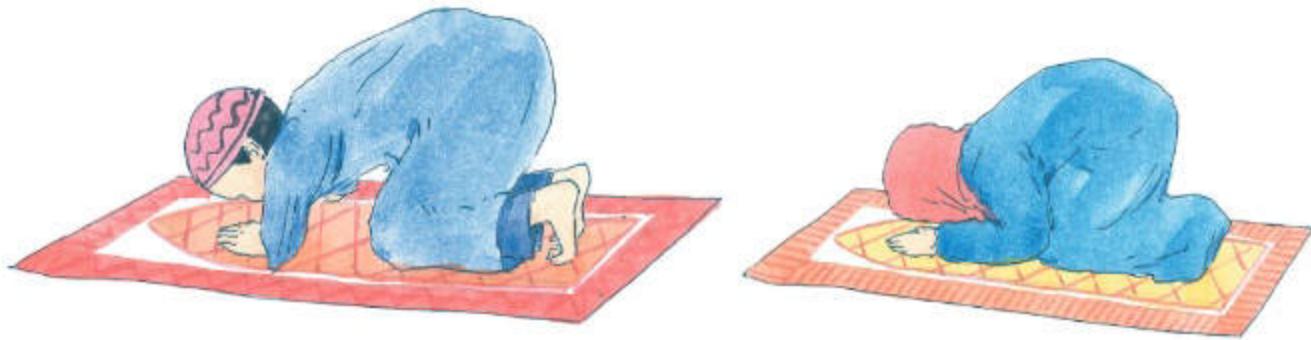
ছবি : সালাতে রুকু সঠিক পদ্ধতি

মেয়েরা বাম পায়ের টাখনু ডান পায়ের টাখনুর সাথে মিলিয়ে রাখবে। এরপর মাথা ঝুঁকিয়ে দুই হাতের আঙুলগুলো মেলানো অবস্থায় দুই ইঁটুর উপর রাখবে। কনুই পাঁজরের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং মাথা এতটুকু ঝুঁকাবে, যাতে ইঁটু পর্যন্ত পৌছে।

এরপর ‘সামিআল্লাহু নিমান হামিদা’ বলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। দাঁড়ানো অবস্থায় ‘রাবীনা লাকাল হামদ’ বলতে হবে। এরপর ‘আল্লাহু আকবার’ বলে সিজদাহ্ করতে হবে।

সিজদাহ্ করার নিয়ম

প্রথমে দুই হাঁটু মাটিতে বা জায়নামাজে রাখতে হবে। তারপর দুই হাত মাটিতে রাখতে হবে। তারপর দুই হাতের মাঝখানে মাথা রেখে নাক ও কপাল মাটিতে রাখতে হবে। সিজদাহর সময় দুই হাতের আঙুলগুলো মিলিত অবস্থায় কিবলামুখী করে রাখতে হবে। দুই পায়ের আঙুলগুলো কিবলামুখী করে মাটিতে লাগিয়ে রাখতে হবে। উভয় পা মিলিত অবস্থায় খাড়া থাকবে।



ছবি: সঠিক পদ্ধতিতে ছেলে-মেয়ের সিজদাহ্ অবস্থা

মেয়েরা পা খাড়া রাখবে না। উভয় পা ডান দিকে বের করে দেবে এবং মাটিতে বিছিয়ে রাখবে।

ছেলেরা সিজদাহ্ সময় মাথা হাঁটু হতে দূরে রাখবে। হাতের কবজির উপরের অংশ মাটিতে

লাগাবে না। পায়ের নলা উরু হতে পৃথক রাখবে।

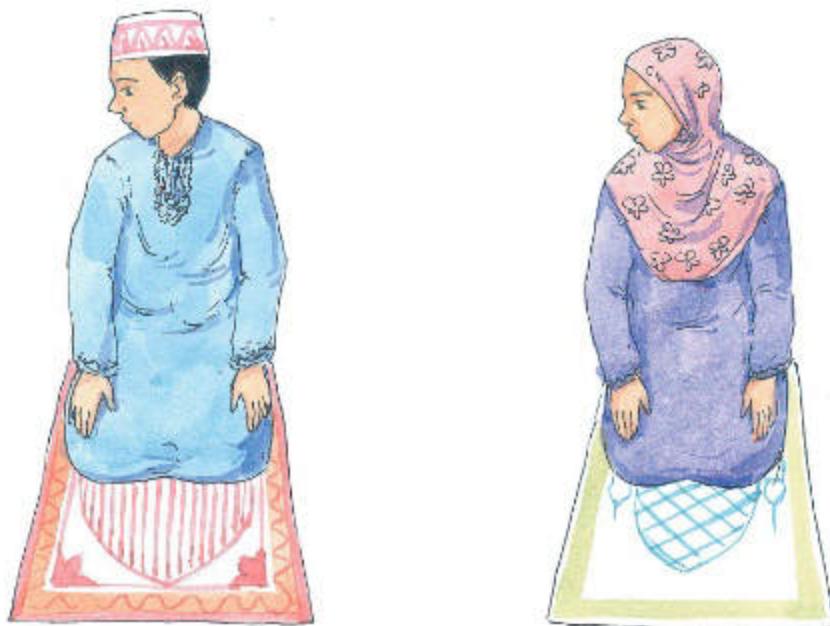
মেয়েরা সর্বাঙ্গ মিলিত অবস্থায় সিজদাহ্ করবে। মাথা যথাসম্মত ইঁটুর কাছে রাখবে। উরু পায়ের নলার সাথে এবং হাতের বাজু পাঁজরের সাথে মিলিয়ে রাখবে। সিজদাহে অন্তত তিনবার ‘সুবহানা রাবিয়াল আলা’ বলতে হয়। এরপর আল্লাহু আকবার বলে সোজা হয়ে বসে দুই হাত ইঁটুর ওপর রাখবে। তারপর আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় সিজদাহ্ করবে এবং পূর্বের মতো তসবি পড়বে। এরপর ‘আল্লাহু আকবার’ বলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। এভাবে প্রথম রাকআত শেষ হবে। এরপর দ্বিতীয় রাকআত শুরু হবে। দ্বিতীয় রাকআতেও প্রথম রাকআতের মতো যথারীতি সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়ে রুকু, সিজদাহ্ করে সোজা হয়ে বসতে হবে। তাশাহহুদ, দরুদ ও দোয়া মাসুরা পড়ে ডানে ও বামে মুখ ফিরিয়ে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ’ বলতে হবে। এভাবে দুই রাকআত বিশিষ্ট সালাত শেষ হবে।



ছবি: সালাতে সঠিক পদ্ধতিতে বসা

তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট সালাত হলে দুই রাকআত পড়া শেষে বসতে হবে এবং তাশাহহুদ পড়া শেষে ‘আল্লাহ আকবার’ বলে দাঁড়াতে হবে। এরপর পূর্বের মতো তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত শেষ করতে হবে। ওয়াজিব ও সুন্নত সালাত হলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা পড়তে হবে। কিন্তু ফরজ হলে অন্য সূরা মেলাতে হবে না। এভাবে যথারীতি

তাশাহুদ, দরূদ, দোয়া মাসুরা পড়ে প্রথমে ডানে এবং পরে বামে মুখ ফিরিয়ে সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করতে হবে।



ছবি: সালাম ফেরানোর সঠিক পদ্ধতি

সালাতের আহকাম-আরকান

সালাত শুরু করার আগে এবং সালাতের ভেতরে কতকগুলো কাজ আছে। এগুলো অবশ্যই পালন করতে হয়। এগুলোর যে কোনো একটি ছুটে গেলে সালাত হয় না। এই কাজগুলোকে সালাতের ফরজ বলে। সালাতের ফরজ ১৪টি। সালাতের এই ফরজ কাজগুলো দুই ভাগে বিভক্ত। ১. আহকাম, ২. আরকান।

আহকাম

সালাত শুরু করার আগে যে ফরজ কাজগুলো আছে, সেগুলোকে সালাতের আহকাম বা শর্ত বলে। আহকাম ৭টি :

১. শরীর পাক : প্রয়োজনমতো ওয়ু, গোসল বা তায়ান্মুমের মাধ্যমে শরীর পাক-পবিত্র করা।
২. কাপড় পাক : পরিধানের কাপড় পাক হওয়া।
৩. জায়গা পাক : সালাত আদায়ের স্থান পাক হওয়া।
৪. সতর ঢাকা : পুরুষের নাভি থেকে ইঁটুর নিচ পর্যন্ত এবং স্ত্রীলোকের মুখমণ্ডল, হাতের কবজি এবং পায়ের পাতা ছাড়া সমস্ত শরীর ঢাকা।
৫. কিবলামুখী হওয়া : কাবার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা।
৬. ওয়াক্ত হওয়া : সালাতের নির্ধারিত সময় হওয়া।
৭. নিয়ত করা : যে ওয়াক্তের সালাত আদায় করবে মনে মনে তার নিয়ত করা।

আরকান

সালাতের তেতরে যে ফরজ কাজগুলো আছে সেগুলোকে সালাতের আরকান বলে। আরকান মোট ৭টি :

১. তাকবিরে তাহরিমা : আল্লাহু আকবার বলে সালাত শুরু করা।
২. কিয়াম : দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা। তবে দাঁড়াতে সক্ষম না হলে বসে বা শুয়ে যে কোনো অবস্থায় সালাত আদায় করতে হয়।
৩. কিরাত : কুরআন মজিদের কিছু অংশ পাঠ করা।
৪. ঝুকু করা।
৫. সিজদাহ করা।
৬. শেষ বৈঠকে বসা : যে বৈঠকে তাশাহুদ, দরুদ, দোয়া মাসুরা পড়ে সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করা হয়, তাকেই বলে শেষ বৈঠক।
৭. সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করা হয়।

কোনো ফরজ কাজ বাদ পড়লে সালাত হয় না। পুনরায় আদায় করতে হয়।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা খাতায় সালাতের আহকাম-আরকানগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করবে।

সালাতের ওয়াজিব

ওয়াজিব মানে অবশ্য করণীয়। গুরুত্বের দিক দিয়ে ফরজের পরেই ওয়াজিবের স্থান। সালাতের মধ্যে কতগুলো ওয়াজিব কাজ আছে। এর যে কোনো একটিও ইচ্ছা করে বাদ দিলে সালাত আদায় হয় না। ভুলে বাদ পড়লে সাত্ত্ব সিজদাহ্ দিতে হয়। সালাতের ওয়াজিব ১৪টি। যথা:

১. প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়া
২. সূরা ফাতিহা পাঠ করে অন্য কোনো সূরা বা তার অংশ পাঠ করব। আয়াত ছোটে হলে কমপক্ষে তিন আয়াত এবং বড়ে হলে কমপক্ষে এক আয়াত পাঠ করবো।
৩. সালাতের ফরজ ও ওয়াজিবগুলো আদায় করার সময় ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।
৪. রুকু করার পর সোজা হয়ে দাঢ়ানো।
৫. দুই সিজদাহ্র মাঝখানে সোজা হয়ে বসা।
৬. তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট সালাতে দ্বিতীয় রাকআতের পর তাশাহুদ পড়ার জন্য বসা।
৭. সালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়া।
৮. মাগরিব, এশার ফরজের প্রথম দুই রাকআতে এবং ফজর ও জুমুআর ফরজ সালাতে এবং দুই ঈদের সালাতে ইমামের সরবে কুরআন পাঠ করা এবং অন্যান্য সালাতে নীরবে পাঠ করা।
৯. বিতর সালাতে দোয়া কুনুত পড়া।
১০. দুই ঈদের সালাতে অতিরিক্ত ছয় তাকবির বলা।
১১. রুকু ও সিজদাহ্য কমপক্ষে এক তসবি পরিমাণ অবস্থান।
১২. সালাতে সিজদাহ্র আয়াত পাঠ করে তিলাওয়াতে সিজদাহ্ করা। কুরআন মজিদে

এমন বিশেষ ১৪টি আয়াত আছে, যা পাঠ করলে বা শুনলে সিজদাহ্ করতে হবে।

১৩. আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ বলে সালাত শেষ করা।

১৪. ভুলে কোনো ওয়াজিব কাজ বাদ পড়লে সাতু সিজদাহ্ দেওয়া।

সাতু সিজদাহ্

সাতু মানে ভুল। সিজদাহ্ সাতু মানে ভুল সংশোধনের সিজদাহ্।

আমরা আগেই জেনেছি, ইচ্ছা করে কোনো ওয়াজিব বাদ দিলে সালাত হয় না। কিন্তু ভুলে কোনো ওয়াজিব বাদ পড়লে তা সংশোধনের উপায় আছে। আর সে উপায় হলো সাতু সিজদাহ্ করা।

সাতু সিজদাহ্ আদায় করার নিয়ম

সালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর শুধু ডান দিকে সালাম ফেরাব। তারপর আল্লাহু আকবর বলে দুটি সিজদাহ্ করব। সিজদাহ্ এর পরে তাশাহহুদ, দরুদ ও দোয়া মাসুরা পড়ব। তারপর ডানে-বামে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা সালাতের ওয়াজিবগুলোর একটি তালিকা খাতায় তৈরি করবে।

মসজিদের আদব (المساجد) আব

মসজিদ অর্থ সিজদাহ্ করার স্থান। সালাত আদায়ের জন্য নির্ধারিত ইবাদতখানাকে মসজিদ বলে। মসজিদে মুসলমানগণ প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাআতের সাথে আদায় করেন। মসজিদে কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদত এবং ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ করা হয়। এ জন্যই মসজিদকে বায়তুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর বলা হয়। নিজেদের বাড়িতে বা অন্য কোনো পবিত্র স্থানেও সালাত আদায় করা যায়। তবে মসজিদে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করলে অনেক বেশি সওয়াব হয়।

দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান হলো মসজিদ। যারা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মসজিদে জামাআতের সাথে আদায় করে, আল্লাহ তাদের খুব ভালোবাসেন।

পৃথিবীতে অসংখ্য মসজিদ আছে। বাংলাদেশে দুই লাখেরও বেশি মসজিদ আছে। ঢাকা শহরকে বলা হয় মসজিদের শহর। দুনিয়ার সকল মসজিদই আল্লাহর ঘর। সকল

মসজিদেই পবিত্র ও সম্মানিত। তবে তিনটি মসজিদের মর্যাদা বেশি। এগুলো হলো মসজিদে হারাম বা কাবা শরিফ। কাবা শরিফ মক্কায় অবস্থিত। মসজিদে নববি বা মদিনার মসজিদ এবং মসজিদে আকসা বা বাযতুল মুকাদ্দাস। মসজিদে আকসা জেরুজালেমে অবস্থিত।

আমরা জানি মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর। দুনিয়ার সবচেয়ে পবিত্র ও সম্মানিত স্থান। আল্লাহ তায়ালা আমাদের খালিক, মালিক। তিনি আমাদের জীবন-মৃত্যুরও মালিক। গাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বাস্দার সাক্ষাৎ ঘটে। বাস্দা তার মাঝের দরবারে হাজিরা দেয়। আল্লাহর দরবারে অতি বিনয় ও বিন্মুভাবে হাজির হতে হবে। অত্যন্ত কাতরভাবে অন্তরের আকৃতি জানাতে হবে। সুতরাং মসজিদের কতগুলো আদব মেনে চলতে হয়। যেমন :

১. পাক-পবিত্র শরীর ও পোশাক নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে হয়।

২. পবিত্র মন ও বিনয়-বিন্মুভাব সাথে মসজিদে প্রবেশ করা।

৩. মসজিদে প্রবেশের সময় এ দোয়া পড়া—**اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ**

বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা।

অর্থ : হে আল্লাহ, আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও।

৪. মসজিদে প্রবেশের সময় হুড়োহুড়ি, ধাকা-ধাকি না করা। মসজিদে কোনো খালি জায়গা দেখে বসা। নিজে না গিয়ে অন্যকে সামনে যেতে বলা উচিত নয়। বেশি জায়গা জুড়ে না বসে, অন্যদের বসার জায়গা করে দেওয়া।

৫. লোকজনকে ডিঙিয়ে সামনের দিকে না যাওয়া।

৬. মসজিদে কোনো অপ্রয়োজনীয় কথা না বলা।

৭. নীরবতা পালন করা। উচ্চস্বরে কথা না বলা।

৮. কুরআন তিলাওয়াত ও ধর্মীয় কথাবার্তা শোনা।

৯. কোনো অবস্থাতেই হৈ চৈ, শোরগোল না করা।

১০. সালাতরত কোনো মুসল্লির সামনে দিয়ে যাতায়াত না করা।
১১. মোবাইল খোলা রেখে বা অন্য কোনোভাবে মসজিদের শৃঙ্খলা ভঙ্গ না করা।
১২. মসজিদে বিনয় ও একাগ্রতার সাথে ইবাদত করা।
১৩. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় এ দোয়া পড়া-

أَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদলিকা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ কামনা করছি।

মসজিদ প্রধানত সালাত আদায়ের জন্য তৈরি হলেও একে কেন্দ্র করে ইসলামি শিক্ষা দীক্ষা পরিচালনা করা যায়। সুন্দর সমাজ ও শিক্ষা-সংস্কৃতি সৃষ্টিতে মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ-ভূমিকা রাখতে পারে। মন্তব্যেও গণশিক্ষা পরিচালিত হতে পারে।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা মসজিদের আদবগুলোর একটি তালিকা খাতায় তৈরি করবে।

সাওম (الصوم)

সাওম আরবি শব্দ। এর অর্থ বিরত থাকা, আত্মসংযম অবলম্বন করা। একে বহুবচনে সিয়াম বলে। আমাদের দেশে সাওমকে সাধারণভাবে রোযা বলা হয়।

আল্লাহ তায়ালার সত্ত্বাটি লাভের উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলে।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামের প্রধান পাঁচটি ব্রুকনের মধ্যে সাওম একটি। মৌলিক ইবাদতগুলোর মধ্যে ইমান ও সালাতের পরেই সাওমের স্থান। সাওম ধনী-দরিদ্র সকল মুসলমানের ওপর ফরজ ইবাদত। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- ‘হে ইমানদারগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরজ করা হলো।’(সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৩)। যেহেতু সাওমকে ফরজ করা হয়েছে, সুতরাং যে তা অঙ্গীকার করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি বিনা ওজরে পালন করবে না সে

গুনাহগার হবে।

সাওম শুধু আমাদের জন্যই ফরজ নয়, আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের ওপরও ফরজ ছিল।

সাওম পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন করা। তাকওয়া মানে আল্লাহকে ভয় করা, সব রকম পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা, সংযম অবলম্বন করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।’ (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৩)

সাওমের মাধ্যমে তাকওয়া শুধু অর্জনই হয় না, এতে তাকওয়ার অনুশীলন ও প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে। পাপাচার ও লোভ-লালসা থেকে বিরত থাকা সহজ কাজ নয়। এ জন্য দীর্ঘমেয়াদি বাস্তব প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন প্রয়োজন। আর এই বাস্তব প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন হয় দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার মাধ্যমে।

এটি আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধির উৎকৃষ্ট উপায়। সাওম পালনকালে মুমিন ব্যক্তি কু-প্রত্যক্ষি, কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। সিয়াম পালনকারীর সামনে যত লোভনীয় খাবার আসুক, যতই ক্ষুধা-ত্বক্ষণ লাগুক সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত সে কিছুই খায় না। যেখানে দেখার মতো কেউ নেই সেখানেও এক কিলু পানি পান করে না।

সাওম হলো আত্মরক্ষা ও আত্মশুদ্ধির ঢাল

সাওম পালনের সময় মিথ্যা, প্রতারণা, হিংসা-বিদ্যে, পরনিষ্ঠা, পরচর্চা, ধূমপান ইত্যাদি ত্যাগ করতে হয়। সুতরাং এসব পাপকর্ম ও বদ্ব্যাস ত্যাগ করা সহজ হয়। এ জন্য সাওমকে আত্মরক্ষার ঢাল বলা হয়েছে। রাসূল (স) বলেছেন,

الصَّوْمُ جُنَاحٌ ‘সাওম হচ্ছে ঢালস্বরূপ।’ (বুখারি)

সাওম পালন উন্নত চরিত্র ও আদর্শ সমাজ গঠনে সহায়ক এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাওম পালনের সময় লোভ-লালসা, পাপাচার, মিথ্যাচার, ঝগড়া-বিবাদ, ত্যাগ করতে হয়। অশ্রীল কথা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়। এতে ব্যক্তি চরিত্র বেমন উন্নত হয়, তেমনি সুন্দর সমাজ গঠনেও সহায়ক হয়।

সাওম পালনের মাধ্যমে মানুষ পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। পানাহার ত্যাগের মাধ্যমে ধনীরা দরিদ্রের অনাহারে-অর্ধাহারে জীবনযাপনের কষ্ট প্রত্যক্ষভাবে এবং বাস্তবে বুঝতে পারে। ক্ষুধার কী জ্বালা, তা তারা অনুভব করতে পারে। তাই তারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। তাদের সাহায্য-সহযোগিতা ও দান-খয়রাত করে। রাসূল (স)

রম্যানকে ‘সহানুভূতির মাস’ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সাওম পালনে অনেক ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। তাই এ মাসকে ধৈর্যের মাস বলা হয়েছে। আর এই ধৈর্যের পূরক্ষর হিসেবে হাদিস শরিফে জান্নাত দানের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

সাওমের মাসকে ফজিলতের দিক দিয়ে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অংশ রহমতের, দ্বিতীয় অংশ মাগফিরাতের এবং তৃতীয় অংশ নাজাতের। নাজাত মানে জাহানামের শাস্তি থেকে মুক্তি।

সাওম একমাত্র আল্লাহরই জন্য নিবেদিত। তাই এর পূরক্ষর স্বয়ং আল্লাহ দেবেন। আল্লাহ বলেন, ‘সাওম কেবল আমারই জন্য, আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব।’ (বুখারি ও মুসলিম)

শুধু সাওম পালনেই ফজিলত নয়; সাওমের সম্মান করলে, সাওম পালনকারীর সম্মান ও সেবা করলেও অনেক সওয়াব পাওয়া যায়। কোনো সাওম পালনকারীকে ইফতার করালে তার সাওমের সম্মান সওয়াব পাওয়া যাবে। এতে সাওম পালনকারীর সওয়াবে কোনো ঘাটতি হবে না।

সাওম পালনকারীর জন্য দুইটি খুশির ক্ষণ, একটি তার ইফতারের সময় এবং আর একটি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। সাওম পালনকারী আল্লাহ তায়ালার কাছে উচ্চতর ব্যক্তিত্বের মর্যাদা লাভ করবে। সুতরাং সাওমের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফজিলত অপরিসীম।

সাওমের নিয়ত

রম্যানের শেষ রাতে সেহরি খাওয়ার পর এই বলে সাওমের নিয়ত করতে হয়- ‘হে আল্লাহ! আমি আগামীকাল রম্যান মাসের ফরজ সাওম রাখার নিয়ত করলাম। তুমি দয়া করে আমার সাওম কবুল করো।’

ইফতারের সময় বলতে হয় : **أَللّهُمَّ لَكَ صُنْتُ وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.**

বাংলা উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা লাকা সুম্তু ওয়া আলা রিজকিকা আফতারতু।

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! তোমারই জন্য সাওম রেখেছি এবং তোমার দেওয়া রিজিক ধারা ইফতার করছি।’

তারাবির সালাত

রম্যানে এশার সালাত আদায়ের পর তারাবির সালাত আদায় করতে হয়। তারাবির সালাত বিশ রাকআত। এ সালাত আদায় করা সুন্নত। রাসূল (স) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি রম্যান মাসে তারাবির সালাত আদায় করে, তার অতীতের গুনাহ মাফ হয়ে যায়।’

আমরা যথাযথভাবে রম্যানের সাওম পালন করব। নিয়মিত তারাবি আদায় করব।

সাওম ভঙ্গ হয়, নষ্ট হয় এমন কোনো কাজ করব না। মিথ্যা কথা বলব না। পরনিন্দা ও পাপাচারে লিপ্ত হব না।

যাকাত (زكوة)

‘যাকাত’ শব্দের অর্থ পরিছন্নতা, পবিত্রতা ও বৃদ্ধি। মুসলমানদের নিসাব পরিমাণ ধন-সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ বছর পূর্তিতে আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত খাতসমূহে ব্যয় করাকে যাকাত বলে।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামের পাঁচটি বুকনের মধ্যে সালাতের পরেই যাকাতের গুরুত্ব বেশি। কুরআন মজিদের বহু স্থানে আল্লাহ তায়ালা সালাতের সাথে যাকাতের কথাই উল্লেখ করে বলেছেন,

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأْتُوا الزَّكُوَةَ

‘তোমরা সালাত কার্যম করো এবং যাকাত দাও।’ (সূরা মুয়াম্বিল, আয়াত: ২০)

যাকাত হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ধনীদের সম্পদে গরিব ও নিঃস্বদের অধিকার। যাকাত দেওয়া দরিদ্রদের প্রতি ধনীদের কোনো অনুগ্রহ বা অনুকূল্য নয়; বরং তার সম্পদকে পবিত্র করার এবং তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার একটি অবশ্য করণীয় ব্যবস্থা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘আর তাদের (ধনীদের) সম্পদে অবশ্যই দরিদ্র ও বিপ্লিতদের অধিকার রয়েছে।’ (আল-যারিয়াত, আয়াত: ১৯)

আমরা জেনেছি, যাকাতের একটি অর্থ পবিত্রতা। যাকাত দিলে দাতার অন্তর কৃপণতার কল্যাণতা থেকে পবিত্র হয়। তার আমলনামা গুনাহ থেকে পবিত্র হয়। ধনীদের সম্পদে গরিবদের অধিকার আছে, একটি নির্দিষ্ট অংশ মিশে আছে। গরিবদের অংশ দিয়ে দিলে

অবশিষ্ট সম্পদ মালিকের জন্য পরিত্র হয়ে যায়। যাকাত না দিলে তা ময়লাযুক্ত থাকে। যাকাত দিলে তা ময়লামুক্ত হয়ে যায়।

যাকাতের আর এক অর্থ বৃদ্ধি। যাকাত দিলে যাকাত দাতার সওয়াব বৃদ্ধি হয়। সামান্য যাকাতের বিনিময়ে পরকালে প্রচুর পুরস্কার লাভ করবেন। শুধু তাই নয়, দুনিয়াতেও আল্লাহ তায়ালা তার সম্পদে রহমত ও বরকত দান করবেন। তার অর্জিত সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘আর তোমরা যে সুদের কারবার করে থাক মানুষের সম্পদের সঙ্গে মিলে সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ার উদ্দেশ্যে, আল্লাহর কাছে তা মোটেই বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু তোমরা আল্লাহর সভূতি লাভের উদ্দেশ্যে যে যাকাত দিয়ে থাক, তাই কেবল বৃদ্ধি পায়— এরাই সম্পদশালী।’ (সূরা রূম, আয়াত: ৩৯)

যাকাত দিলে ধনী-গরিবের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হয়, ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। মহানবি (স) বলেছেন,

الرَّحْمَةُ قَنْطَرَةُ الْإِسْلَامِ

অর্থ : যাকাত ইসলামের (ধনী-গরিবের মধ্যে) সেতুবন্ধ। (মুসলিম)।

যাকাত দিলে ধনী-গরিবের ব্যবধান কমে যায়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের খালিক ও মালিক। সকল ধনসম্পদের মালিকও তিনি। ‘সম্পদের মালিকানা আল্লাহর’ এ কথার বাস্তব প্রমাণ ঘটে যাকাতে। সম্পদের প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ বিধায় সম্পদ তাঁর বিধান অনুযায়ী গরিবদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। যাকাত না দিলে আল্লাহর মালিকানা অঙ্গীকার করা হয়। যারা সম্পদ পুঁজীভূত করে রাখে, যাকাত দেয় না, তাদের পরকালে কঠিন আজাব ভোগ করতে হবে।

যাকাতের নিসাব

নিসাব মানে নির্ধারিত পরিমাণ বা মাত্রা। যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত ফরজ হয়, তাকে নিসাব বলে। অর্থাৎ দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ব্যয় বাদে নিসাব পরিমাণ মালের অধিকারী হলে বছর পৃত্তিতে একটি নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর নির্ধারিত খাতে যাকাত দিতে হয়। নিম্নোক্ত সম্পদ নিসাব পরিমাণ থাকলে যাকাত দিতে হয়।

১. সোনা, রূপা (নগদ অর্থ ও গহনাপত্রসহ), ২. গবাদি পশু, ৩. জমিতে উৎপন্ন ফসল,
৪. ব্যবসা-বাণিজ্যের পণ্য, ৫. অর্জিত সম্পদ ইত্যাদি।

সোনা সাড়ে সাত ভরি বা সাড়ে সাত তোলা (৮৭.২৫ গ্রাম) অথবা রূপা সাড়ে বায়ান্ত তোলা (৬১২.২৫ গ্রাম) বা এর তৈরি গহনা থাকলে যাকাত দিতে হয়। এর কোনো একটি অথবা উভয়টির মূল্য পরিমাণ অন্য কোনো সম্পদ থাকলেও যাকাত দিতে হবে।

নিসাব পরিমাণ সম্পদের চলিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হয়। প্রতি একশত টাকার যাকাত হয় আড়াই টাকা। উৎপাদিত ফসল, দ্রব্যাদি, পশু ইত্যাদির যাকাতের হিসাব করে জানতে পারব।

যাকাতের মাসারিফ বা খাত

‘মাসারিফ’ অর্থ ব্যয়ের খাতসমূহ। যাদের যাকাত দেওয়া যায় তাদেরকে বলে যাকাতের মাসারিফ। সবাইকে যাকাত দেওয়া যায় না। কেবলমাত্র আট শ্রেণির লোককে যাকাত দেওয়া যায়। তারা হলো :

১. ফকির বা অভাবগ্রস্ত,
 ২. মিসকিন বা সম্মুখীন,
 ৩. যাকাতের জন্য নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ,
 ৪. ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে এমন ব্যক্তি
 ৫. দাসমুক্তি,
 ৬. খণ্ঠগ্রস্ত,
 ৭. আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী
 ৮. অসহায় পথিকদের জন্য।
- যাকাতের এ খাতগুলো আল্লাহর নির্ধারিত।

যাকাত দিলে মাল পবিত্র হয়। সম্পদ ও সওয়াব বৃদ্ধি পায়। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূর হয়। মুসলিমদের মধ্যে আত্মত্বের সেতুবন্ধ সৃষ্টি হয়। সমাজ থেকে অভাবজনিত অসামাজিক কার্যকলাপ ও অপরাধ দূর হয়। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। আল্লাহ তায়ালা খুশি হন।

যাকাত না দিলে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বৃদ্ধি পায়। বৈরিতা সৃষ্টি হয়। সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয়। আখিরাতে রয়েছে কঠিন আজাব। আমরা হিসাব করে নিয়মিত যাকাত দেওয়ার জন্য পিতা মাতাকে বলব। আল্লাহর পথে অকাতরে ব্যয় করব। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে সচেষ্ট হব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা যাকাতের মাসারিফ অর্থাৎ যাদের যাকাত দেওয়া যায়, খাতায় তাদের একটি তালিকা তৈরি করবে।

হজ (حج)

হজ শব্দের অর্থ— ইচ্ছা করা, সংকল্প করা, কোনো পবিত্র স্থান দর্শনের সংকল্প করা।

আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য ও সম্মুক্ষি লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে, বিশেষ অবস্থায়, নির্দিষ্ট স্থানে, নির্ধারিত নিয়মে, নির্দিষ্ট কর্তগুলো অনুষ্ঠান পালন করাকে হজ বলে। নির্দিষ্ট সময় বলতে ৮ জিলহজ থেকে ১২ জিলহজ পর্যন্ত সময়কে বোঝায়। বিশেষ অবস্থা বলতে ইহরামের অবস্থাকে বোঝায়। নির্দিষ্ট স্থান বলতে কাবা শরিফ (সাফা-মারওয়াসহ) এবং তার আশপাশের আরাফাত, মিনা, মুজদালিফা প্রভৃতি স্থানকে বোঝায়। নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান বলতে ইহরাম, তওয়াফ, সাঁই, ওকুফ (অবস্থান), কুরবানি প্রভৃতি হজের নির্ধারিত অনুষ্ঠানগুলোকে বোঝায়।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামের পাঁচটি স্তৰের একটি হলো হজ। হজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ইবাদত। প্রত্যেক সুস্থ, প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান ও সামর্থ্যবান মুসলিম নর-নারীর ওপর জীবনে একবার হজ করা ফরজ। এরপর যতবার হজ করবে, তা হবে নফল। নফল হজেও অনেক সওয়াব।

হজ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِنَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

অর্থ : ‘আল্লাহর উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ শরিফে হজ পালন করা মানুষের ওপর অবশ্য কর্তব্য; যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে।’ (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৯৭)

যে সব লোক বায়তুল্লাহ পর্যন্ত যাতায়াতের দৈহিক ক্ষমতা রাখে এবং হজ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবারের আবশ্যকীয় ব্যয় বাদে যাতায়াতের খরচ বহন করতে সক্ষম তাদের ওপর হজ ফরজ। মহিলা হাজি হলে একজন পুরুষ সফরসঙ্গী থাকতে হবে এবং সফরসঙ্গীর ব্যয় নির্বাহে সক্ষম হতে হবে। মহিলা হাজির সফরসঙ্গী হবেন স্বামী অথবা এমন আতীয়, যার সাথে বিবাহ সম্পর্ক হারাম। যেমন-পিতা, ছেলে, ভাই, চাচা, মামা ইত্যাদি।

কাবা আল্লাহর ঘর। পৃথিবীর প্রাচীনতম ইবাদতখানা। এটিই আমাদের কেবলা, বিশ্ব মুসলিমদের কেবলা এবং মিলনকেন্দ্র। সুতরাং হজ হচ্ছে বিশ্ব মুসলিমের মহাসম্মেলন। বিশ্ব মুসলিম যে এক, অখণ্ড উন্মত, হজ তার জুলন্ত প্রমাণ। গায়ের রং, মুখের ভাষা, আর জীবন পদ্ধতিতে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, এই সম্মেলনে তারা একাকার হয়ে যায়, তাদের সব পার্থক্য দূর হয়ে যায়। সকলের পরনে ইহরামের সাদা কাপড়। সকলের ধর্ম এক, উদ্দেশ্য এক, অন্তরে এক আল্লাহর ধ্যান, সকলেই আল্লাহর বাস্তা।

সকলেই ভাই ভাই। এ সবই মুসলিমদের বিশ্বজনীন আত্ম ও সাম্যের এক অপূর্ব পুলক শিরণ জাগায়। তাদের মধ্যে ভালোবাসা গড়ে উঠে। সবার কঠে একই আওয়াজ ‘লাকায়েক আল্লাহুম্মা লাকায়েক’। ‘হাজির হে আল্লাহ আমরা তোমার দরবারে হাজির।’ হজ প্রত্যেক হাজিকে মুসলিম বিশ্বের লাখে মুসলিমদের সাথে পরিচয়ের বিরাট সুযোগ করে দেয়। একটি সফরে বহু সফরের সুফল পাওয়া যায়। ইসলামের ঐক্য, সাম্য, আত্ম ও প্রাণচান্ডল্য বজায় রাখার ব্যাপারে হজের তাৎপর্য অপরিসীম। হজ মানুষের অতীত জীবনের গুনাগুলো ধূয়ে-মুছে সাফ করে দেয়, মাফ করে দেয়। রাসূল (স) বলেছেন, ‘পানি যেমন ময়লা ধূয়ে পরিষ্কার করে দেয়, হজও তেমনি গুনাগুলোকে ধূয়ে পরিষ্কার করে দেয়।’ (বুখারি)

রাসূল (স) আরও বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ করল, তারপর কোনো অশ্লীল কাজ করল না, পাপ কাজ করল না, সে নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে ফিরল।’ (বুখারি ও মুসলিম)।

হজের প্রধান কাজগুলো হলো ইহরাম বাঁধা, কাবাঘর তওয়াফ করা। সাফা-মারওয়ার মাঝে সাই করা। আরাফাত ময়দানে ওকুফ বা অবস্থান করা। মুজদালিফায় রাত্রি যাপন করা। মিনায় কুরবানি করা ইত্যাদি।

হজের ফরজ

হজের ফরজ তিনটি : ১. ইহরাম বাঁধা, ২. আরাফাতে অবস্থান এবং ৩. তওয়াফে যিয়ারাত। কোনো ফরজ বাদ পড়লে হজ হয় না।

১. হজের প্রথম ফরজ হলো ইহরাম বাঁধা। হজ ও উমরার নিয়তে পবিত্রতা অর্জনের পরে সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করাকে ইহরাম বলে। মৃতপ্রায় ফকিরের বেশে আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হয়। এ সময় রঙিন কাপড় পরা যাবে না। সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে না। চুল, নখ কাটা যাবে না। কোনো স্থলপ্রাণী শিকার করা যাবে না। এমনকি মশা, মাছি, উকুল ইত্যাদিও মারা যাবে না। সব ধরনের বাগড়া, বিবাদ ও পাপকর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে। ইহরামের সাথে সাথে ‘লাকায়েক আল্লাহুম্মা লাকায়েক, লা-শারিকা লাকা লাকায়েক, ইন্নাল হামদা ওয়াননি মাতা লাকাওয়াল মূল্ক লা শারিকা লাকা’ দোয়াটি বারবার পড়তে হবে। একে বলে তালবিয়াহ।

২. ওকুফ বা অবস্থান। হজের দ্বিতীয় ফরজ হলো ৯ই জিলহজ তারিখে আরাফাত ময়দানে অবস্থান করা।
৩. তওয়াফে যিয়ারত। হজের তৃতীয় ফরজ হলো তওয়াফে যিয়ারত করা। কুরবানির দিনগুলোতে অর্ধাং জিলহজ মাসের ১০-১২ তারিখের মধ্যে কাবাঘরে তওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করাকে তওয়াফে যিয়ারত বলে। এই তিনি দিনের যেকোনো দিন এই তওয়াফ করা যায়। তবে প্রথম দিনে তওয়াফ করা উত্তম। এই তিনি দিনের পরে তওয়াফ করলে দণ্ডস্বরূপ (দম) একটি কুরবানি করতে হবে।

কুরবানি (الْأُضْحِيَّةُ)

কুরবানি শব্দের অর্থ নৈকট্য, ত্যাগ, উৎসর্গ। আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ত্যাগ ও উৎসর্গ করা।

আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ত্যাগের মনোভাব নিয়ে ১০ জিলহজ হতে ১২ জিলহজ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গৃহপালিত হালাল পশু আল্লাহর নামে উৎসর্গ করাকে কুরবানি বলে। কুরবানি করতে হয় উট, মহিষ, গরু, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি গৃহপালিত হালাল, সুস্থ ও সবল পশু দ্বারা।

নিসাব পরিমাণ মালের মালিক সকল প্রাণ্বয়ক নর-নারীর ওপর কুরবানি করা ওয়াজিব।

কুরবানি আল্লাহর নবি হয়রত ইবরাহীম (আ) ও হয়রত ইসমাইল (আ)-এর অতুলনীয় নিষ্ঠা ও অপূর্ব ত্যাগের পুণ্যময় সূত্রি বহন করে। কুরবানি দ্বারা মুসলিম মিল্লাত ঘোষণা করে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তারা জানমাল সবকিছু কুরবানি করতে প্রস্তুত। কুরবানির নজিরবিহীন ত্যাগের ইতিহাস শরণ করে মুসলমানগণ আল্লাহর দরবারে শপথ করেন যে, হে আল্লাহ! আমাদের জান-মাল, জীবন-মৃত্যু তোমারই জন্য উৎসর্গ করছি। তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমরা যেভাবে পশু কুরবানি করছি, তেমনিভাবে আমাদের জীবন উৎসর্গ করতেও কৃষ্ণিত হব না।

কুরবানি করতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ত্যাগের মনোভাব নিয়ে। অহংকার বা গর্বের মনোভাব নিয়ে নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘আল্লাহর নিকট সেগুলোর (কুরবানির পশুর) গোশত এবং রক্ত কিছুই পৌছায় না, পৌছায় শুধু তোমাদের তাকওয়া।’ (সূরা হজ, আয়াত: ৩৭)

মানুষের মধ্যে যেমন মনুষ্যত্ব আছে, তেমনি পশুত্বও আছে। কুরবানির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরবানির মাধ্যমে পশুত্বকে হত্যা করে মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলা।

১. আমরা আগেই জেনেছি যে, নিসাব পরিমাণ মালের মালিক মুসলিম নর-নারীর ওপর কুরবানি ওয়াজিব। তবে নাবালেগের ওপর কুরবানি ওয়াজিব নয়, দিলে সওয়াব হয়।
২. জিলহজ মাসের ১০, ১১ এবং ১২ তারিখ পর্যন্ত কুরবানির সময়। তবে ঈদুল আযহার সালাতের পরে কুরবানি করতে হয়।
৩. ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, গরু, মহিষ, উট ইত্যাদি গৃহপালিত হালাল, সুস্থ ও সবল পশু দ্বারা কুরবানি করতে হয়। পশুটি নির্দোষ ও নিখুঁত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
৪. ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা জনপ্রতি একটি করে কুরবানি করতে হয়। গরু, মহিষ ও উট সাতজন পর্যন্ত শরিক হয়ে কুরবানি করা যায়। তবে সবার উদ্দেশ্যই আল্লাহর নৈকট্য লাভ হতে হবে।
৫. ছাগল, ভেড়া ও দুম্বার বয়স কমপক্ষে এক বছর; গরু, মহিষ দুই বছর এবং উট কমপক্ষে পাঁচ বছর বয়সের হতে হবে।
৬. কুরবানির গোশত সাধারণত তিনি ভাগ করে এক ভাগ গরিব-মিসকিন, এক ভাগ আত্মীয় স্বজন এবং এক ভাগ নিজে রাখতে হয়।
৭. কুরবানির গোশত বা চামড়া মজুরির বিনিময়ে দেওয়া যায় না। কুরবানির পশুর রক্ত ও বর্জ্য মাটিতে পুঁতে রাখতে হয়।

কুরবানি প্রচলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আল্লাহর আদেশে একদিন হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর স্ত্রী হাজেরা এবং তাঁদের বৃন্দ বয়সের একমাত্র শিশুপুত্র ইসমাইল (আ)-কে মৰায় তখনকার দিনে লুপ্ত কাবার নিকটবর্তী জনমানব শূন্য মরুভূমিতে রেখে চলে যান। আল্লাহ তায়ালার অপার করুণায় তাঁরা নিরাপদে থাকেন।

ইসমাইল (আ) যখন কিশোর বয়সে উপনীত, তখন ইবরাহীম (আ) তাঁদের দেখতে এলেন। এবার তিনি এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, আল্লাহ তাঁকে আদেশ করছেন প্রিয় পুত্র ইসমাইল (আ)-কে কুরবানি করতে। একই স্বপ্ন দেখলেন

বারবার। তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পুত্রকে কুরবানি করতে মনস্থির করলেন। তিনি তাঁর স্বপ্নের কথা ইসমাইল (আ)-কে জানিয়ে বললেন, ‘হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি তোমাকে জবাই করছি। এখন তোমার অভিমত কী বলো।’ উভয়ে ইসমাইল (আ) বললেন, ‘হে আমার আবো, আপনি তাই করুন যা আপনাকে আদেশ করা হয়েছে। ইনশাআল্লাহ আমাকে ধৈর্ঘ্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।’ (সূরা আস-সাফাত, আয়াত: ১০২)

পথে পিতা-পুত্রকে শয়তান ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাঁরা শয়তানকে পাথর মেরে তাড়িয়ে দিলেন।

ইবরাহীম (আ) আল্লাহর প্রতি তাঁর পুত্রের এমন আনুগত্য, নিষ্ঠা ও সাহসিকতাপূর্ণ উভয়ের খুশি হলেন। তিনি প্রাণপীয় পুত্রকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানি করতে তাঁর গলায় ছুরি চালালেন। পুত্র ইসমাইলও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ধারাল ছুরির নিচে মাথা পেতে দিলেন। এবারের কঠিন পরীক্ষায়ও পিতা-পুত্র উন্নীর্ণ হলেন। আল্লাহ তায়ালা কুরবানি কবুল করলেন এবং ইসমাইলকে রক্ষা করলেন। তাঁর পরিবর্তে একটি দুঃখ কুরবানি হয়ে গেল।

আল্লাহ তায়ালার প্রতি হ্যারত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ)-এর অপরিসীম আনুগত্য ও অপূর্ব ত্যাগের ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য এবং মুসলিমদের ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত করার জন্য তখন থেকে কুরবানির প্রচলন রয়েছে। এটি চিরকালের জন্য মানবসমাজে একটি পবিত্র ধর্মানুষ্ঠানরূপে প্রতিষ্ঠিত।

কুরবানির শিক্ষা

১. মুসলিমদের ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত করাই কুরবানির উদ্দেশ্য।
২. আমাদের জান-মাল, জীবন-মৃত্যু আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করা।
৩. কুরবানি দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মানুষের তাকওয়া যাচাই করেন। আল্লাহর কাছে কুরবানির পশুর রক্ত, মাংস কিছুই পৌছায় না, পৌছায় শুধু অন্তরের তাকওয়া ও নিষ্ঠা।
৪. মানুষের মধ্যে যেমন মনুষ্যত্ব আছে, তেমনি পশুত্বও আছে। কুরবানির মাধ্যমে পশুত্বকে হত্যা করে মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলা হয়। মানুষের লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেশ, অহংকার ইত্যাদি পাশবিক চরিত্র বিসর্জন দিয়ে মানবীয় গুণাবলি উজ্জীবিত করতে পারলেই কুরবানি স্বার্থক হয়।

৫. কুরবানির একটি অংশ গরিব-মিসকিনকে দিতে হয়, এতে তাদের একটু ভালো খাওয়ার সুযোগ হয়। আত্মারস্তজনকে দিতে হয়, এতে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হয়। সকলের মধ্যে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়।

আকিকা (الْعَقِيقَة)

‘আকিকা’ শব্দের অর্থ ভাঙ্গা, কেটে ফেলা। সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে সন্তানের কল্যাণ ও হিফাজত কামনায় আল্লাহর ওয়াক্তে কুরবানির মতো কোনো গৃহপালিত হালাল পশু জবাই করাকে আকিকা বলে।

আকিকা করতে হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আকিকা করা সুন্নত। এতে সন্তান বেমন আল্লাহর রহমতে বালা-মুসিবত ও বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ থাকে, তেমনি অনেক সওয়াব পাওয়া যায়। সন্তানের আকিকা করতে অবহেলা করা উচিত নয়। হাদিস শরিফে আছে— ‘প্রতিটি নবজাত সন্তান আকিকার সাথে বন্দি। তার জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু জবাই করতে হবে, তার নাম রাখতে হবে এবং তার মাথা মুক্তন করতে হবে।’ (তিরমিজি)

রাসূল (স) নিজের আকিকা নিজেই করেছিলেন। তিনি অন্যকেও আকিকা করতে উৎসাহ দিতেন। সন্তান জন্মের ৭ম দিনে আকিকা করা উচ্চম। তবে ১৪, ২১ বা ২৮তম দিনেও আকিকা করা যায়।

মুসলিম পিতা-মাতাকে সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে চারটি কাজ করতে হয়—

১. সন্তানের সুন্দর ইসলামি নাম রাখা। নাম শুনলেই যেন বোঝা যায় যে, সে মুসলিম সন্তান।
২. মাথা কামানো।
৩. মাথার চুলের ওজন পরিমাণ সোনা বা রূপা দান করা।
৪. আকিকা করা।

আদায়ের নিয়ম

ছেলে সন্তানের জন্য ছাগল, ভেড়া, দুর্ঘার দুটি অথবা গরু, মহিষ বা উটের দুই ভাগ এবং মেয়ে সন্তানের জন্য ছাগল, ভেড়া, দুর্ঘার একটি অথবা গরু, মহিষ বা উটের এক

অংশ আকিকা দিলে যথেষ্ট হবে। হাদিসে আছে :

“ছেলে সন্তানের জন্য দুটি ছাগল ও মেয়ে সন্তানের জন্য একটি ছাগল জবেহ করাই যথেষ্ট।” (আবু দাউদ ও নাসায়ি)

সামর্থ্য না থাকলে ছেলে সন্তানের জন্যও একটি দেওয়া যাবে। যে সকল পশু দ্বারা কুরবানি করা যায়, সে সকল পশু দ্বারা আকিকা করা যায়। কুরবানির সাথে আকিকারও অংশীদার হওয়া যায়। কুরবানির পশুর গোশত যেভাবে বণ্টন করা উত্তম, আকিকার গোশতও সেভাবে বণ্টন করা উত্তম। আকিকার পশুর চামড়াও গরিব মিসকিনদের দান করতে হয়।

ব্যবহারিক দোয়া

পরম করুণাময় আল্লাহ আমাদের খালিক ও মালিক। তিনি আমাদের মাবুদ। আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য রাসূল(স)-এর দেখানো পথে যে কোনো বৈধ কাজই আল্লাহর ইবাদত। আল্লাহর রহমত ছাড়া কোনো কাজে সফলতা আসে না। আমরা সব সময় আল্লাহর রহমত চাইব, তাঁর কাছে সাহায্য চাইব। তাঁরই নাম নিয়ে ভালো কাজ শুরু করব। রাসূল(স) কোনো কাজ শুরু করার আগে দোয়া পড়তেন। আমরা কাজ শুরু করার আগে দোয়া পড়ে নেব। এগুলোকে বলা হয় ব্যবহারিক দোয়া। এগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজের আগে পড়তে হয়।

১. কোনো ভালো কাজ শুরু করার আগে বলব –

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অর্থ : “দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।”

২. খাওয়ার পরে আল্লাহর শোকর করে বলব –

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ

অর্থ : “সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

৩. পরস্পর সৌক্ষ্যাং হলে বলব –

أَلْسَلَامُ عَلَيْكُمْ

অর্থ : “আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।”

৪. **সালামের জবাবে বলব-**

ওয়ায়ালাইকুমসালামু ওয়া রহমাতুল্লাহ-**وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ**

অর্থ : “আপনার ওপরও শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।”

৫. **হাঁচি দিয়ে বলতে হয়-**

الْحَمْدُ لِلَّهِ

অর্থ : “সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।”

৬. **যে শুনবে সে বলবে-**

يَرْحَمُكَ اللَّهُ

অর্থ : “আল্লাহ আপনাকে রহমত করুন।”

৭. **ঘুমানোর আগে পড়তে হয়-**

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأِلُكَ أَمْوَاتَ وَآخِي

বাংলা উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বিইসমিকা আমুতু ও আহইয়া।

অর্থ : “হে আল্লাহ, তোমার নাম নিয়ে ঘুমাই, আর তোমার নাম নিয়েই জেগে উঠি।”

৮. **ঘুম থেকে জেগে এ দোয়া পড়তে হয়-**

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَّاَنَا وَإِلَيْهِ التَّشْوِرُ

বাংলা উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহিল্লায়ি আহইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর।

অর্থ : “সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাদের ঘুমের পর জাগালেন, তাঁর কাছেই আমরা পুনরায় ফিরে যাব।”

৯. **কোনো কবর দেখলে এই দোয়া পড়বে-**

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ -

অর্থ : “হে কবরবাসীগণ! তোমাদের ওপর শান্তি বর্ধিত হোক।”

১০. মসজিদে প্রবেশের সময় এই দোয়া পড়তে হয়-

আল্লাহুম্মাফ তাহলি আবওয়াবা রাহমাতিকা- **أَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ**

অর্থ : “হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও।”

১১. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় পড়তে হয়-

আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদলিকা- **أَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ**

অর্থ : “হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ কামনা করছি।”

আমরা ব্যবহারিক দোয়াগুলো ঠিকমতো শিখব এবং নিয়মিত পড়ব। এতে আল্লাহ তায়ালা খুশি হবেন। আমাদের কাজে বরকত ও সওয়াব হবে। বড় হয়ে আরও দোয়া শিখব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা মসজিদে প্রবেশের ও বের হওয়ার দোয়া খাতায় আরবি ও বাংলায় লিখবে।

পরিচ্ছন্নতা **النَّظَافَةُ**

শরীর, পোশাক ও স্থান বা পরিবেশের পরিষ্কার, পরিপাটি, নির্মল ও ময়লামুক্ত অবস্থাকে বলে পরিচ্ছন্নতা। আর বিশেষ পদ্ধতিতে দেহ, মন, পোশাক ও পরিবেশের পরিচ্ছন্নতাকে বলে তাহারাত বা পবিত্রতা। পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতাকে আলাদা করা যায় না।

পরিচ্ছন্নতা বা পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ। আল্লাহ তায়ালা চিরপবিত্র। যারা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও পাকসাফ থাকে তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন। আমাদের প্রিয় নবি (স) সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতেন। তিনি সবাইকে পাকসাফ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে নির্দেশ দিতেন।

যারা অপরিচ্ছন্ন থাকে, নোংরা থাকে তাদের শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। তাদের কেউ ভালোবাসে না, তাদের নানা রকম অসুখ-বিসুখ হয়।

মুখ আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আমরা মুখ দিয়ে খাবার খাই। কথা বলি। মুখ পরিষ্কার না থাকলে মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। মানুষ তাকে ঘৃণা করে। লোক সমাজে

লজ্জা পেতে হয়। মানুষেরও কষ্ট হয়। মহানবি (স) দুর্গন্ধযুক্ত কোনো কিছু খেয়ে মসজিদে যেতে নিষেধ করেছেন।

আমরা দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খাবার থাই। এতে দাঁতের ফাঁকে খাদ্যকগা লেগে থাকে। প্রতিবার খাওয়ার পরে, বিশেষ করে ঘুমানোর আগে দাঁত না মাজলে দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকা খাদ্যকগা পাঁচে মুখে দুর্গন্ধ হয়। দাঁতের নানা রকম রোগ হয়। দাঁত পরিষ্কার রাখার জন্য ওয়ু করার আগে মিসওয়াক করতে হয়, দাঁত মাজতে হয়। রাসূল (স) বলেছেন—“আমার উশ্মাতের কষ্ট না হলে, প্রত্যেক ওয়ুর আগে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।”

আমরা হাত দিয়ে নানা রকম কাজ করি। এতে হাত ময়লা হয়, নোংরা হয়। অনেক সময় হাতের নখ বড় হয়। বড় নখে অনেক ময়লা আটকে থাকে। আমরা হাত দিয়ে খাবার থাই। নোংরা হাতে খাবার খেলে খাবারের সাথে ময়লা পেটে চলে যায়। এতে নানা রকম পেটের অসুখ হয়। আমাদের নখ কেটে ছোট রাখতে হবে। ভালোভাবে হাত ধূয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। খাওয়ার আগে ও পরে ভালোভাবে হাত ধূতে হবে। পায়খানা প্রস্তাব থেকে ফিরে সাবান দিয়ে হাত ধূতে হবে।

রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা করার সময় আমাদের পায়ে ধূলা-ময়লা লাগে। পা নোংরা হয়ে যায়। কাজের শেষে পা ধূয়ে-মুছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়।

আমরা আমাদের শরীর, পোশাক ও পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখব, পরিচ্ছন্ন রাখতে সহায়তা করব।

পরিকল্পিত কাজ : কীভাবে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, শিক্ষার্থীরা তার একটি কর্মপন্থা তৈরি করবে এবং ছুটির দিনে পরিবেশ-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।

ধর্মীয় অনুশাসন পালনে আন্তরিকতা

ধর্মীয় অনুশাসন পালনে তথা ইবাদতে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা একান্ত আবশ্যিক। ইবাদত অনুষ্ঠানের মূল কথা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হতে হবে। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা না থাকলে সালাত, সাওম, হজ ও যাকাতের মতো মৌলিক ইবাদতগুলোও ইবাদত হিসেবে গণ্য না-ও হতে পারে, যদি ঐ ইবাদতকারীর নিয়ত অসৎ ও আল্লাহবিমুখ হয়।

আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের জন্য যে বিশেষ যোগ্যতা ও অনুশীলনের প্রয়োজন, তা গড়ে তোলে সালাত। সালাতের বহুমুখী শিক্ষাজীবনে প্রতিফলিত করতে পারলে অন্যান্য

ইবাদত ও সৎকর্ম পালন করা সহজ হয়ে ওঠে। সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সামনে চরম ও পরম দাসত্বের প্রমাণ দেওয়া হয়। বিনয় ও বিন্মুত্তার চরম পরীক্ষার প্রমাণ পায়। সালাত হচ্ছে মুমিনের মিরাজ, আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য লাভের উপায়। সালাত যেমন পাপ মুক্ত করে, তেমনি চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করে।

পক্ষান্তরে সালাতে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা না থাকলে, লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করলে আল্লাহ তায়ালার কাছে সেই সালাতের কোনো মূল্য নেই। এই ধরনের সালাতের কোনো উপকারিতা নেই।

ধন-সম্পদের প্রতি মানুষের আর্কিবণ ও ভালোবাসা একান্ত সহজাত। এ সম্পদগ্রীতি মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে যেকোনো বৈধ-অবৈধ পথে সম্পদ অর্জন করতে চায়। এই সম্পদে সমাজের কোনো কল্যাণ হয় না। যাকাত ব্যবস্থার প্রধান গুরুত্ব হচ্ছে, যাকাত বিধান মানুষের মন মানসিকতার অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধন করে। “সম্পদের মালিকানা আল্লাহর” এই ভাবধারার বাস্তব প্রমাণ ঘটে যাকাতে। সম্পদের প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ। তার বিধান অনুযায়ী সম্পদ বিতরণ করতে হবে সমাজের গরিব শ্রেণির মানুষের মধ্যে। মানুষের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনে যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। এতে হৃদয়-মন থেকে কৃপণতা দূর হয়। যাকাত দানে যেমন সম্পদ পবিত্র হয়, তেমনি ব্যক্তি ও সমাজ থেকে হিংসা-বিদ্যে, হানাহানি দূর হয়। ধনী-গরিবের মধ্যে সেতুবন্ধন তথা সামাজিক সম্পৰ্কি সৃষ্টি হয়। সমাজে আর্থিক নিরাপত্তা ও ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। যাকাত দিতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আর্থিক কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে। দানশীলতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্য থাকলে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

সাওম পালন বা সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষের পাশবিকতার দমন এবং সৎ প্রবৃত্তির বিকাশ ঘটে। সাওম পালনে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার প্রকৃত প্রমাণ পাওয়া যায়। সাওমের উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি অর্জন করা। এতে সবর, সহানুভূতি ও সমবেদনার অনুশীলন হয়। সাওম হচ্ছে উচ্চ পর্যায়ের নৈতিকতার অনুশীলন ও পরিচর্যা। মিথ্যা, অসৎকাজ ও অসংচিত্তা ত্যাগ না করলে আল্লাহর কাছে সাওম কবুল হয় না।

আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে বাস্তার গভীর সম্পর্ককে মানিয়ে নেওয়ার মাধ্যম হচ্ছে হজ। একজন আল্লাহ প্রেমিক বাস্তা মায়াময় জগতের আর্কিবণ ছিন্ন করে আল্লাহর সান্নিধ্যে ছুটে যায়। ‘আল্লাহ আমি হাজির, আল্লাহ আমি হাজির’ বলতে বলতে আল্লাহর ঘরের দোর

গোড়ায় উপনীত হয়; আল্লাহ প্রেমে সিন্ত হয়ে অন্তরের আকূল প্রার্থনা জানায়— “আমি হাজির তোমার কাছে, আল্লাহ! আমি হাজির তোমার কাছে, সকল প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই, মালিকানা ও সার্বিক ক্ষমতা তোমারই। তোমার কোনো অংশীদার নেই।”

হজের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার অনুভূতির প্রতিফলন ঘটে। আল্লাহর ভালোবাসা, তাঁর প্রতি ভরসা ও আত্মাগের মহান শিক্ষা নিহিত রয়েছে হজের প্রতিটি কাজে। কলহমুক্ত বিশ্ব সমাজ গঠন, বিশ্বভাত্ত্ব, সাম্য ও আন্তর্জাতিক সমরোতা সৃষ্টিতে হজের গুরুত্ব অপরিসীম। হজ বিশ্ব মুসলিমের মহাসম্মেলন। এর মাধ্যমে মহানবি (স) সাহাবা কেরাম ও পূর্ববর্তী নবিগণের স্মৃতি ও কীর্তির সাথে পরিচয় ঘটে। আবার এই হজ পালনে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা না থাকলে হজের সুফল পাওয়া যায় না।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মীয় অনুশাসন পালনে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা না থাকলে কোনো সুফল পাওয়া যায় না। অতএব আমরা পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ধর্মীয় অনুশাসনগুলো যথাযথভাবে পালন করব।

সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শুন্দৰীল হওয়া

ইসলাম উদার মানবতা বোধসম্পন্ন, পরমতসহিষ্ণু একটি আন্তর্জাতিক জীবনব্যবস্থা। ইসলাম সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি উদার, সহনশীল ও শুন্দৰীল। ইসলামে যেমন আছে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় নীতিমালা, তেমনি আছে ন্যায়-নীতিভিত্তিক উদার, পরমতসহিষ্ণু, আন্তর্ধর্মীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা। মানবতার ঐক্য, সংহতি, বিশ্বশান্তি ও বিশ্বভাত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা অপরিসীম। বিভিন্ন ধর্মের এবং ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে ইসলামে সুস্পষ্ট নীতিমালা বিদ্যমান।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ মূলগতভাবে একই পিতা-মাতা আদম (আ) ও হাওয়া (আ)— এর সন্তান। যদিও পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রভাবে তাদের মধ্যে বিভিন্নতা এসেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘হে মানব জাতি, আমি তোমাদের একজন নর ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বহু গোত্রে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার।’ (সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১৩)

ইসলাম মানবতার ঐক্যে বিশ্বাস করে, বিভেদ পছন্দ করে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً

অর্থ : “মানুষ একই উম্মতের অঙ্গরূপ” (সূরা বাকারা, আয়াত: ২১৩)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) শুধু আরব দেশ, আরব জাতি বা শুধু মুসলমানদের জন্যই প্রেরিত হননি। তিনি গোটা মানব জাতির জন্য প্রেরিত ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

“আমি আপনাকে গোটা মানবজাতির কাছেই পাঠিয়েছি।” (সূরা সাবা, আয়াত: ২৮)

ইসলামের মতো এমন উদারতার নজির আর কোথাও পাওয়া যাবে না। ইসলামের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে :

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَهْلِ قُرْبَةٍ

অর্থ : “রাসুলদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না।” (সূরা বাকারা, আয়াত: ২৮৫)।

সকল রাসুলের প্রতি বিশ্বাস করা মুসলিমদের ইমানের অঙ্গ। পারস্পরিক বিশ্বাস ও পারস্পরিক শুন্দু পোষণ করা সুসম্পর্ক গড়ে তোলার পূর্বশর্ত। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও শুন্দু না থাকলে সুসম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। ইসলামের সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠানেও পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে তোলার উপাদান পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান।

হযরত মুহাম্মদ (স) মদিনায় হিজরত করেই মদিনা ও তার আশেপাশে বসবাসকারী গোত্রগুলোর সাথে একটি বিশ্বখ্যাত সনদপত্র সম্পাদন করেন, যা ইতিহাসে “মদিনা সনদ” নামে খ্যাত। এ সনদ সাম্যের মহান নীতি, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, জানমালের নিরাপত্তা, সকল ধর্মের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ঘোষণা ও রক্ষাকৰ্চ। এ সনদের মাধ্যমে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা-নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার তথা মানবাধিকার স্থাকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

শুধু শান্তিকালীন নয়, যুদ্ধকালীন সময়ও ইসলাম অন্য ধর্ম, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ধর্ম যাজকদের রক্ষা নিশ্চিত করত। এদের ধ্বংস বা আক্রমণ করা কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ ছিল।

মহানবি (স) ও মুসলিমগণ আক্রান্ত না হলে কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন না। মহানবি (স) যুদ্ধের তুলনায় সন্ধি ও সুসম্পর্ক গড়ে তোলাকে বেশি অগ্রাধিকার দিতেন। হুদায়বিয়ায় তিনি কাফেরদের অন্যায় আবদার মেনে নিয়েও শান্তির উদ্দেশ্যে সন্ধি করেছিলেন। তিনি হাবশার রাজা আসহাম নাজাশির সাথে অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন এবং তাঁর কাছে পত্র লিখেছিলেন। তাবুক বিজয়ের পর আয়লা অধিপতি ইউহান্নার সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। এভাবে বাহরাইন ও নাজরানের অধিবাসীদের সাথে সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন।

মহানবি (স) হিজরতের পরেই মদিনা ও তার আশপাশের বিভিন্ন গোত্র ও রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তিনি রোম ও পারস্য সম্রাটসহ রাজন্যবর্গের কাছে উপটোকন পাঠাতেন এবং তাঁদের উপটোকন গ্রহণ করতেন। অনেকের কাছে শান্তিদৃত ও পত্র পাঠিয়েছিলেন।

পরিকল্পিত কাজ : বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামে যে নীতিমালা আছে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করবে।

অনুশীলনী

নৈর্যক্তিক প্রশ্ন:

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন
সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও

১. ইবাদত শব্দের অর্থ কী ?

- | | |
|--------------|------------------|
| ক. প্রার্থনা | খ. আনুগত্য |
| গ. দান করা | ঘ. সিয়াম সাধনা। |

২. ইসলাম কয়টি রূক্ন-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত ?

- | | |
|-----------|-----------|
| ক. তিনটি | খ. চারটি |
| গ. পাঁচটি | ঘ. সাতটি। |

৩. সালাতের নিয়ন্ত্রণ সময় কয়টি ?

- | | |
|-----------|-----------|
| ক. তিনটি | খ. চারটি |
| গ. পাঁচটি | ঘ. সাতটি। |

৪. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে কত রাকআত ফরজ ?

- | | |
|---------------|----------------|
| ক. পাঁচ রাকআত | খ. দশ রাকআত |
| গ. পনের রাকআত | ঘ. সতের রাকআত। |

৫. সালাতের আরকান কয়টি ?

- | | |
|-----------|------------|
| ক. পাঁচটি | খ. সাতটি |
| গ. তেরটি | ঘ. পনেরটি। |

৬. কাবা শরিফ কোথায় অবস্থিত ?

- | | |
|---------------|----------------|
| ক. মক্কায় | খ. মদিনায় |
| গ. জেরুজালেমে | ঘ. ফিলিস্তিনে। |

৭. দীন ইসলামের সেতু কী ?

- | | |
|----------|-----------|
| ক. সালাত | খ. সাওম |
| গ. হজ | ঘ. যাকাত। |

৮. হজের ফরজ কয়টি

- | | |
|-----------|-----------|
| ক. তিনটি | খ. চারটি |
| গ. পাঁচটি | ঘ. সাতটি। |

৯. আল্লাহর কাছে কুরবানির কী পৌছায় ?

- | | |
|------------|------------|
| ক. গোশত | খ. রক্ত |
| গ. তাকওয়া | ঘ. চামড়া। |

১০. সকল রাসূলের প্রতি বিশ্বাস করা মুসলিমদের কী ?

- | | |
|-------------|-----------------|
| ক. ইচ্ছাধীন | খ. ইমানের অঙ্গ। |
| গ. সৌজন্য | ঘ. সুন্দর আচরণ। |

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর

১. —— ইমানের অঙ্গ।
২. সালাত দীন ইসলামের ——।
৩. সালাত —— চাবি।
৪. —— মানে সংক্ষিপ্তকরণ।
৫. সালাতের তেতরের ফরজগুলোকে —— বলে।
৬. ঢাকা শহরকে বলা হয় —— শহর।
৭. সাওমের মূল উদ্দেশ্য হলো —— অর্জন করা।
৮. —— অর্থ যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ।
৯. জীবনে —— হজ করা ফরজ।
১০. পরস্পর সাক্ষাৎ হলে বলব ——।

গ. বাম দিকের শব্দের সঙ্গে ডান দিকের শব্দের অর্থ মিলাও

বাম	ডান
১. ইবাদত	শুনা প্রার্থনা করা
২. সালাত	অমণকারী
৩. মুসাফির	বিরত থাকা
৪. সাওম	আনুগত্য
৫. যাকাত	নির্ধারিত পরিমাণ
৬. নিসাব	সংকল্প করা
৭. হজ	পরিত্রাতা ও বৃদ্ধি
৮. কুরবানি	ভেঙে ফেলা
৯. আকিকা	উৎসর্গ

ঘ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- (১) ইবাদত কাকে বলে?
- (২) আল্লাহ আমাদের কেন সৃষ্টি করেছেন?
- (৩) ইসলামের বুকন কয়টি ও কী কী?
- (৪) পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম লেখ।
- (৫) সালাতের নিয়ন্ত্র সময়গুলো কী কী?
- (৬) মুসাফির কাকে বলে?
- (৭) আহকাম কাকে বলে?
- (৮) আরকান কাকে বলে?
- (৯) সাওম কাকে বলে?
- (১০) সাওমের মাসকে ফজিলতের দিক দিয়ে কয় ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে?
- (১১) যাকাত কাকে বলে?
- (১২) হজ কাকে বলে?

(১৩) হজের ফরজ কয়টি এবং কী কী?

(১৪) কুরবানি কাকে বলে?

(১৫) আকিকা কাকে বলে?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন-

- (১) ইবাদতের তাৎপর্য বর্ণনা কর।
- (২) সালাতের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
- (৩) পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময় বর্ণনা কর।
- (৪) সালাতের ফজিলত ও শিক্ষা বর্ণনা কর।
- (৫) দুই রাকআত ফরজ সালাত আদায়ের নিয়ম লেখ।
- (৬) সালাতের আহকামগুলো লেখ।
- (৭) সালাতের আরকান বলতে কী বোঝা? আরকান কী কী?
- (৮) সালাতের ওয়াজিব কী কী?
- (৯) মসজিদের আদবগুলো কী কী?
- (১০) সাওমের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সংক্ষেপে লেখ।
- (১১) যাকাতের তাৎপর্য ও শিক্ষা বর্ণনা কর।
- (১২) যাকাতের মাসারিফ কয়টি ও কী কী, বর্ণনা কর।
- (১৩) হজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য লেখ।
- (১৪) হজের ফরজগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
- (১৫) মুখ, দাঁত, হাত ও পা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার গুরুত্ব বর্ণনা কর।
- (১৬) কুরবানি প্রচলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা কর।
- (১৭) ধর্মীয় অনুশাসন পালনে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার গুরুত্ব বর্ণনা কর।
- (১৮) সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি উদার, সহিষ্ণু ও সহনশীল হওয়ার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

আখলাক বা চরিত্র ও নৈতিক মূল্যবোধ

আখলাক অর্থ স্বভাব ও চরিত্র। স্বভাব ও চরিত্রকে আরবিতে আখলাক বলে। চরিত্র ভালো হলে জীবন সুন্দর হয়। সুখের হয়। যার চরিত্র সুন্দর এবং আচরণ ভালো সে সদা সত্য কথা বলে, পিতা-মাতার কথা শোনে, শিক্ষককে সম্মান করে, সৃষ্টির সেবা করে, জাতীয় সম্পদ রক্ষা করে, সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করে।

আর যার চরিত্র সুন্দর নয় এবং আচরণ মন্দ সে মিথ্যা বলে, পিতামাতার অবাধ্য হয়, মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করে, জাতীয় সম্পদ রক্ষা করে না, সৃষ্টির সেবা করে না ইত্যাদি। যার চরিত্র ও আচরণ সুন্দর সবাই তাকে ভালোবাসে। বয়সে বড় হলে সবাই তাকে সম্মান করে। শৃঙ্খলা করে। আর বয়সে ছোট হলে সবাই তাকে আদর করে। স্নেহ-যত্ন করে। সবাই বলে তার চরিত্র ভালো। সে উন্নত লোক।

মহানবি (স) বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে সর্বোন্নত সেই লোক যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।”

যার চরিত্র সুন্দর নয়, আচরণ ভালো নয়, কেউ তাকে ভালোবাসে না। শৃঙ্খলা করে না। আদর ও স্নেহ করে না। সবাই তাকে ঘৃণা করে। অবিশ্বাস করে। কেউ তাকে সাহায্য সহযোগিতা করে না।

আখলাক ও নৈতিক মূল্যবোধের একটি আদর্শ কাহিনি

হ্যারত আন্দুল কাদির জিলানী (র) উচ্চ শিক্ষার জন্য বাগদাদ রওনা দেবেন। মা তাঁর জামার আস্তিনের মধ্যে চপ্পিশটি সোনার মুদ্রা সেলাই করে দিলেন। আর রওনা দেওয়ার পূর্বে পুত্রকে বললেন, ‘সর্বদা সত্য কথা বলবে, কখনো মিথ্যা বলবে না।’ তিনি কাফেলার সাথে বাগদাদ রওনা দিলেন। পথিমধ্যে একদল ডাকাত কাফেলার ওপর হামলা করল। ডাকাতের দল কাফেলার সকলকে একের পর এক তল্লাশি করল। তাদের কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিল। তারা আন্দুল কাদির জিলানী (র)-কে জিজ্ঞাসা করল, ‘হে বালক! তোমার কাছে কী আছে?’ তিনি নির্ভয়ে উত্তর দিলেন, ‘চপ্পিশটি সোনার মুদ্রা আছে।’ ডাকাতরা ধমকের সুরে বলল, কোথায় ‘সোনার মুদ্রা?’ উত্তরে আন্দুল কাদির জিলানী (র) বললেন, এগুলো আমার জামার আস্তিনের মধ্যে সেলাই করা আছে।’ তাঁর সততা ও সত্যবাদিতা দেখে ডাকাত

দলের সরদারের বিবেক খুলে গেল। সে অনুতপ্ত হলো। তারা সকলে তওবা করল এবং সৎপথ ধরল।

এভাবে সুন্দর আখলাক ও নৈতিক মূল্যবোধ মানুষকে মুক্তি দেয়। মানব সমাজ আলোর পথ পায়। বস্তুত সুন্দর আখলাক ও নৈতিক মূল্যবোধ মানবজীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের চরিত্র সুন্দর ও আচরণ ভালো করতে হলে আমরা-

আল্লাহর ইবাদত করব, পিতা-মাতার কথা শুনব।

শিক্ষককে সম্মান করব, সত্য কথা বলব।

সৃষ্টির সেবা করব, জাতীয় সম্পদ রক্ষা করব।

মানবাধিকার ও বিশ্বাত্ম গড়ে তুলব।

আমরা কতগুলো মন্দ আচরণ থেকে দূরে থাকব। যেমন-

আমরা মিথ্যা কথা বলব না, ঝগড়া-বিবাদ করব না।

হিংসা করব না, চুরি-ভাকাতি করব না।

ধূমপান করব না, দেশের ও জনগণের ক্ষতি করব না।

আল্লাহর ইবাদত ভুলব না, কটু কথা বলব না।

পরিকল্পিত কাজ : ভালো আচরণ এবং মন্দ আচরণের পৃথক পৃথক চার্ট তৈরি কর।

সৃষ্টির সেবা (خدمة الخلق)

আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন মানুষ, জীবজন্তু, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ। তিনি সৃষ্টি করেছেন চাঁদ-সুরুজ, গ্রহ-তারা, নদীনদা, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা এবং আরো অনেক কিছু। আল্লাহর এই সব সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সবার সেরা। আর তিনি এই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকারের জন্য। তাই মানুষ আল্লাহর সকল সৃষ্টির প্রতি দয়া দেখাবে। সহানুভূতি প্রদর্শন করবে। এরই নাম সৃষ্টির সেবা।

যারা আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া দেখায় এবং সৃষ্টির সেবা করে আল্লাহ তাদের প্রতি খুশি হন। তাদের ভালোবাসেন। তাদের ওপর রহমত বর্ষণ করেন।

মহানবি (স) বলেছেন:

إِنَّمَا مَنِ اتَّقَى الْأَرْضَ يَرَى حُكْمَمَ مَنِ فِي السَّمَاءِ

অর্থ: “পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাদের প্রতি দয়া দেখাও। আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।”

আল্লাহর ইবাদতের পর আমাদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের সেবা করা। আল্লাহর সকল সৃষ্টির সেবা করা। আমরা একে অপরের প্রতি দয়া দেখাব। সহানুভূতিশীল হব। যদি আমরা কারো প্রতি দয়া না দেখাই তাহলে আল্লাহ আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। আমাদের ওপর দয়া করবেন না। মহানবি (স) বলেছেন:

لَا يَرَى حُمُّرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرَى حُمُّرُ النَّاسَ

অর্থ: “যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া দেখায় না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া দেখান না।”

আমরা মানুষের সেবা করব। অসুস্থ ব্যক্তির সেবাযত্ত করব। ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেব। বন্ধুহীনকে বন্ধু দান করব। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেব। দরিদ্র ও ভিক্ষুককে সাহায্য করব। বেকার লোকদের কাজের ব্যবস্থা করে দেব। বন্ধুবান্ধব, আতীয়স্থজন ও প্রতিবেশী বিপদে পড়লে সাহায্য-সহযোগিতা করব। মহানবি (স) বলেছেন, ‘তোমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও, অসুস্থ ব্যক্তির সেবা কর এবং বন্দিকে মুক্তি দাও।’

শুধু মানুষ নয়, সকল জীবজন্তু, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালাসহ আল্লাহর সকল সৃষ্টির সেবা করব। গরু-ছাগল, কুকুর-বিড়াল ইত্যাদি কোনো প্রাণীকে কষ্ট দেব না। প্রহার করব না। এদের ঘৃত্ত করব। কোনো জীবজন্তু বিপদে পড়লে তাকে উদ্ধার করব। তাকে বাঁচাব। আর এ সবই নৈতিক মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্ত।

হাদিস শরিফে উল্লেখ আছে, “একদা এক মহিলা পথের পাশে দেখতে পান যে, একটি কুকুর পিপাসায় খুবই কাতর। আর্তনাদ করছে। এখনই মারা যাবে এমন অবস্থা। মহিলার দয়া হলো। তিনি কাছেই একটি কূপ দেখতে পেলেন এবং কূপ থেকে পানি আনলেন। কুকুরের মুখের সামনে পানি ধরলেন। পানি পান করে কুকুরটি আরাম পেল। সে প্রাণে বেঁচে গেল।

মহিলা আল্লাহর সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া দেখালেন। কুকুরটিকে সেবা করলেন। এ জন্য আল্লাহ ঐ মহিলার প্রতি খুশি হলেন। তার জীবনের সব পাপ ক্ষমা করে দিলেন।”

একটি আদর্শ কাহিনি

ফুয়াদ পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। একদিন সে ঝুলে যাওয়ার পথে একটি গরুর গাড়ি দেখল। গাড়িতে মালামাল বোঝাই খুব বেশি। এদিকে গাড়ির চাকা খাদে পড়ে গেছে। গরু খাদ থেকে গাড়িটি টেনে তুলতে পারছে না। গরুর খুব কষ্ট হচ্ছে। গরুর কষ্ট দেখে ফুয়াদের খুব কষ্ট হলো। তার দয়া হলো। সে গাড়ির গাড়োয়ানকে সাহায্য করল। গাড়িটি ঠেলে খাদ থেকে রাস্তার ওপরে উঠিয়ে দিল।



বোঝাই গাড়ি ঠেলে তুলছে

অতপর সে গাড়োয়ানকে বলল, চাচাজান, গরু-মহিয় তাদের কষ্টের কথা কাউকে বলতে পারে না। বেশি বোঝা চাপালে এদের খুব কষ্ট হয়। আল্লাহ অস্তুষ্ট হন। গুনাহ হয়। গাড়োয়ান ফুয়াদের ব্যবহারে খুব খুশি হলো। সে ফুয়াদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করল।

আমাদের মহানবি (স) সৃষ্টির সেবার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তিনি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মানুষের সুখ-দুঃখের খোঁজখবর নিতেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময় মসজিদে সকলের খোঁজখবর নিতেন। তিনি শুধু মানব জাতির কল্যাণকামী ছিলেন না বরং আল্লাহর সকল

সৃষ্টির প্রতি সদয় ছিলেন। তিনি সারা জীবন সৃষ্টির সেবা করে গেছেন। এ জন্য আল্লাহ রক্তুল আলামীন তাঁকে ‘রাহমাতুল্লিল আলামীন’ বা ‘সমগ্র বিশ্বের রহমত স্বরূপ’ উপাধিতে ভূষিত করেছেন

পরিকল্পিত কাজ : কী কী উপায়ে সৃষ্টির সেবা করা যায় তার একটি তালিকা শিক্ষার্থীরা খাতায় সূন্দর করে লিখবে।

দেশপ্রেম (حُبُّ الْوَطَنِ)

দেশপ্রেম অর্থ দেশকে ভালোবাসা, স্বদেশকে ভালোবাসা, জন্মভূমিকে ভালোবাসা। নিজের দেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার নামই দেশপ্রেম।

আমাদের মহানবি (স) তাঁর জন্মভূমি মক্কা নগরীকে খুব ভালোবাসতেন। মক্কার লোকজনকে মনেপাণে ভালোবাসতেন। তিনি মক্কাবাসীকে সত্য ও ন্যায়পথে চলার আহ্বান জানিয়েছিলেন। প্রথম দিকে তারা মহানবি (স)-এর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তারা তাঁর ওপর নির্মম অত্যাচার শুরু করেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে হত্যা করার ঘড়িয়ে লিপ্ত হয়েছিল। তখন তিনি আল্লাহর নির্দেশে নিজের জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করেছিলেন।

হিজরতের সময় মহানবি (স) তাঁর জন্মভূমি মক্কানগরী ছেড়ে যেতে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছিলেন। খুব ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি মক্কা ছেড়ে যাওয়ার সময় অশুভেজা চোখে বারবার মক্কার দিকে তাকাচ্ছিলেন। আর কাতরকষ্টে বলছিলেন:

“হে মক্কানগরী, তুমি কত সুন্দর!

তুমি আমার জন্মভূমি, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

তুমি আমার কাছে কতই না প্রিয়!

হায়! আমার স্বজাতি যদি ঘড়িযন্ত্র না করত,

এদেশ থেকে আমাকে তাড়িয়ে না দিত

আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।”

স্বদেশের প্রতি মহানবি (স)-এর কী গভীর ভালোবাসা! কী মধুর টান! কী অটুট দেশপ্রেম।

আমাদের জন্মভূমি এই বাংলাদেশ। আমাদের স্বদেশ এই বাংলাদেশ। আমরা আমাদের প্রিয় জন্মভূমি এই বাংলাদেশকে ভালোবাসব। প্রাণের চেয়েও ভালোবাসব। দেশের সকল সম্পদকে ভালোবাসব ও যত্ন করব। দেশের সম্পদ সত্রক্ষণ করব। আর এগুলো করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

জাওয়াদের আক্বার নাম আব্দুল্লাহ আল মামুন। জাওয়াদ তার আক্বাকে জিজ্ঞাসা করল: আমরা দেশকে কীভাবে ভালোবাসব, বাংলাদেশকে কীভাবে ভালোবাসব আবু!

জাওয়াদের আবু উত্তরে বললেন, আমরা এভাবে দেশের সেবা করে দেশের প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি :

- ক. দেশের সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করব, কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য করব।
- খ. গৃহপালিত পশুপাখির যত্ন নেব, তাদের কোনো কষ্ট দেব না।
- গ. বৃক্ষরোপণ করব, ফলমূলের গাছ লাগাব, গাছ নষ্ট করব না, পাতা ছিঁড়ব না।
ডাল ভাঙব না।
- ঘ. বেঝে, দেয়ালে বা অন্য কোথাও আজেবাজে কিছু লিখব না, সবকিছু পরিচ্ছন্ন
রাখব, সত্রক্ষণ করব।
- ঙ. পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস অপচয় করব না, জাতীয় সম্পদ রক্ষা করব।
- চ. দেশকে ভালোবাসব, দেশের মানুষকে ভালোবাসব, সুন্দর সোনার বাংলাদেশ গড়ে
তুলব।



জীবে দয়া ও বৃক্ষরোপণ

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা কীভাবে দেশপ্রেম গড়ে তুলবে, তার একটি চার্ট খাতায় তৈরি করবে।

ক্ষমা (الْعَفْوُ)

ক্ষমা আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ গুণ। মানুষ ভুল করে। অন্যায় করে। গুনাহ করে। মানুষ অন্যায়-অপরাধ করার পর যদি অনুত্পন্ন হয়, তাহলে আল্লাহ নিজগুণে অনুত্পন্ন ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেন। যদি তিনি মানুষের অপরাধ ও গুনাহ ক্ষমা না করতেন, তাহলে কেনো গুনাহগার ব্যক্তি তার শাস্তি থেকে রেহাই পেত না। আল্লাহ ক্ষমা পছন্দ করেন।

আল্লাহ ক্ষমাশীল। তিনি যেমন মানুষকে ক্ষমা করে দেন, তেমনি মানুষের কর্তব্য অন্য অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়। আল্লাহ বলেন, “যারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং লোকদেরকে

ক্ষমা করে, এরূপ নেক বাল্দাদের আল্লাহ ভালোবাসেন।”

ক্ষমা করা মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। যার মন উদার, মানুষের জন্য যার দয়ামায়া বেশি, যে রাগ দমন করতে পারে, সেই ক্ষমাশীল হয়। ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে সকলেই ভালোবাসে। আল্লাহও ভালোবাসেন। এ ধরনের লোকদের জন্য আল্লাহ পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেছেন: ‘যে ক্ষমা করল, বাগড়া-বিবাদ মীমাংসা করে দিল, তার জন্য আল্লাহর কাছে পুরস্কার রয়েছে।’

একটি আদর্শ কাহিনি

আমাদের মহানবি (স)-এর সারাজীবনই ছিল ক্ষমার উজ্জ্বল আদর্শ। তিনি ছিলেন মানব জাতির পরম বন্ধু। কাফেররা তাঁর ওপর নির্মম অত্যাচার করত। তাঁকে মক্কা ছাড়তে বাধ্য করল। তিনি আল্লাহর নির্দেশে জীবন রক্ষার্থে এবং ইসলাম প্রচারের জন্য তায়েফে গমন করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন পালিত পুত্র যায়িদ (রা)। তায়েফবাসী তাঁর ইসলাম প্রচার শুনলো না। তারা তাঁকে লাঢ়িত করল। তারা পাথরের আঘাতে তাঁকে এবং যায়িদ (রা) কে রক্তাক্ত করল। আল্লাহর রহমতে তাঁরা দুজনে রক্তাক্ত অবস্থায় তায়েফ থেকে ফিরে আসলেন। কিন্তু তবুও দয়ার নবি (স) তায়েফবাসীদের জন্য বদদোয়া করলেন না। তিনি আল্লাহর কাছে এই দোয়া করলেন, ‘হে আল্লাহ! তারা অবুব, তারা কিছুই বোঝে না। তুমি তাদের ক্ষমা কর।’

মহানবি (স) তাঁর প্রাণের শত্রুদের হাতের মুঠোয় পেয়েও কোনো দিন তাদের ওপর প্রতিশোধ নেননি। তিনি হাসিমুখে তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি মক্কাবাসীকে ক্ষমা করে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। মহানবি (স)-এর প্রেম ও ক্ষমার আদর্শে মুগ্ধ হয়ে মক্কাবাসী স্বেচ্ছায় দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এভাবে মহানবি (স)-এর ক্ষমার আদর্শে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মকানগরী তাওহিদের আলোকে উত্তোলিত হয়েছিল।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীগণ শ্রেণিকক্ষে ক্ষমার গুরুত্ব সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করবে এবং সকলে ক্ষমার গুরুত্ব সম্বন্ধে জানবে। সকলে ক্ষমা করা শিখবে এবং ক্ষমা করবে।

ভালো কাজে সহযোগিতা করা এবং মন্দ কাজে বাধা দেওয়া

ছেট-বড় যত সদাচার এবং সৎ কাজ- এ সবই ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, গরিব ও দুঃস্থদের জন্য সেবা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা, তাদের আবশ্যনের জন্য শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, রাস্তাঘাট মেরামত ও তৈরি করা। এসব ভালো কাজে একে অপরের সহযোগিতা করতে হয়। যদি এলাকায় রাস্তাঘাট না থাকে তাহলে যাতায়াত ও চলাফেরার খুব অসুবিধা হয়। খাল ও পানির নালার উপরে পুল ও সাঁকো না থাকলে যাতায়াতের সমস্যা হয়। তাই সকলে মিলে রাস্তাঘাট, পুল ও সাঁকো তৈরি করব। একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করব। তাহলে কোনো কাজ সম্পন্ন করতে অসুবিধা হয় না।



চিত্র : সমবায়ের ভিত্তিতে সাঁকো তৈরি করা হচ্ছে

কাজটা সুন্দর হয়। গ্রাম ও মহল্লার সকলে মিলেমিশে ভালো কাজ করলে গ্রাম ও মহল্লাটি সুন্দর হয়। একটি আদর্শ গ্রাম ও মহল্লা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। কথায় বলে-

দশে মিলে করি কাজ
হারি জিতি নাহি লাজ।

আমরা ময়লা-আবর্জনা ফেলার একটি নির্দিষ্ট জায়গা তৈরি করব। সকলে ডাস্টবিন অথবা নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলব। আমরা সকলে মিলে একটি ছোটখাটো গ্রন্থাগার গড়ে তুলব। অবসর সময়ে সেখানে গিয়ে বই পড়ব। আমরা সকলে মিলে রাস্তার পাশে বা ফাঁকা স্থানে গাছ লাগাব। ফুল ও সবজির বাগান করব। এগুলোর ঘৃত নেব। যেখানে-সেখানে প্রস্তাব-পায়খানা করা উচিত নয়। আমরা সবাই মিলে প্রত্যেক পরিবারের জন্য দু-একটি করে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন তৈরি করব। আমরা মাঝে মাঝে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানে বড়দের সাথে অংশ নেব। বড়দের সাহায্য করব। আমরা লেখাপড়ার পাশাপাশি এ ধরনের উন্নয়নমূলক কাজে অংশ নেব। পরিবার, বিদ্যালয় ও এলাকার উন্নতি করব।

খারাপ ও অসৎ কাজই মন্দ কাজ। কোনো কিছু চুরি করা, ছিনতাই করা, ঝাগড়া ও মারপিট করা ইত্যাদি মন্দ কাজ। এসব মন্দ কাজে কখনো একে অপরের সাহায্য-সহযোগিতা করা উচিত নয়। মন্দ কাজে বাধা দিতে হয়। যদি আমাদের কোনো সহপাঠী বই, খাতা কিম্বা পেসিল চুরি করে, শ্রেণিকক্ষের মধ্যে হৈ চৈ ও গঙ্গাগোল করে, কোনো কিছু দিয়ে বেঞ্চের কোনা কাটে, দেয়ালে কালির দাগ দেয়, তাহলে আমরা এসব মন্দ কাজে তাকে বাধা দেব। এগুলো করতে নিষেধ করব। যদি সে আমাদের নিষেধ না শোনে তাহলে শিক্ষকের কাছে তার এসব মন্দ আচরণের কথা জানাব। শিক্ষক তাকে এসব মন্দ কাজ করতে বিরত রাখবেন। সংশোধন করে দেবেন। বাধা দেবেন।

সব ভালো কাজে সহযোগিতা করা এবং সব মন্দ কাজে বাধা দেওয়া ইসলামের নির্দেশ এবং নৈতিক মূল্যবোধের বহিঃপ্রকাশ। মহানবি (স) বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কাউকে মন্দ কাজ করতে দেখে তাহলে সে যেন নিজের শক্তি দিয়ে তাকে বাধা দেয়। আর যদি সে শক্তি দিয়ে তাকে বাধা দিতে অপারগ হয়, তাহলে উপদেশের মাধ্যমে যেন তাকে সংশোধন করে। আর যদি তাও না পারে, তাহলে সে যেন তার প্রতি ঘৃণা করে। আর এটাই দুর্বল ইমানের পরিচয়।’

আমাদের মহানবি (স) ও তাঁর সাহাবিগণ সর্বদা ভালো কাজে সহযোগিতা এবং মন্দ কাজে বাধা প্রদান করতেন। ফলে তাঁদের সমাজ অত্যন্ত সুন্দররূপে গড়ে উঠেছিল। কেউ ভুলে অথবা গোপনে মন্দ কাজ করলে সে নিজেই অনুতপ্ত হতো। লজ্জা পেত। মহানবি (স)-এর কাছে চলে আসত। নিজের পাপের কথা স্বীকার করত। তওবা করত।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, “সৎকাজ ও তাকুওয়ার ব্যাপারে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা কর, পাপ ও সীমালজ্বনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর না।” (সূরা আল মায়দা, আয়াত-২)

আমরা আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলব। মহানবি (স)-এর উপদেশ মেনে চলব। ভালো কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করব। কেউ মন্দ কাজ করলে তাকে বাধা দেব। মন্দ কাজ করা থেকে বিরত রাখব। সুন্দর পরিবেশ গড়ব। সুন্দর সমাজ গড়ব। সুন্দর সোনার বাংলাদেশ গড়ব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা ভালো কাজের এবং মন্দ কাজের একটি তালিকা পাশাপাশি খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

সততা

সততা মানে সাধুতা, মানবতা, সত্যবাদিতা। নিজের স্বার্থ বড় করে না দেখা এবং অপরের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হোক তা না চাওয়ার নামই সততা। যার মধ্যে এই মহৎ গুণটি রয়েছে, তাকে সৎ ব্যক্তি বলা হয়। যার মধ্যে সততা আছে, সে ন্যায়নীতির প্রতি শৃন্দা রাখবে। তার মধ্যে মানবতাবোধ থাকবে। সে সর্বদা সত্য কথা বলবে এবং মানুষের বিশ্বাস অর্জন করবে। এমনকি তার চরম শত্রুরাও তাকে বিশ্বাস করবে। সততা মানুষকে ভালো কাজের দিকে পরিচালিত করে। আর ভালো কাজ মানুষকে জান্নাতে পৌছে দেয়। তাই ইসলাম আমাদের কথাবার্তায়, কাজকর্মে ও আচার-আচরণে সততা রক্ষা করার জন্য জোর তাগিদ দিয়েছে।

অপরপক্ষে যে সমাজে সততার অভাব রয়েছে, সেখানে সুখ ও শান্তি নেই। সেখানে অশান্তি আর অশান্তি। সেখানে বদনাম বিরাজ করে। অসত্য এবং সততার অভাব মানুষকে সমাজে হেয় করে তোলে। যে সমাজে সত্যবাদিতা ও সততার অভাব ঘটে সে

সমাজ আন্তে আন্তে ধর্মসের পথে চলে যায়। ধর্ম হয়ে যায়। প্রতারণা ও দুর্নীতি সে সমাজকে আচ্ছন্ন করে। মহানবি (স) বলেছেন.

الصِّدْقُ يُنْجِي وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ

অর্থ: সততা ও সত্যবাদিতা মানুষকে মুক্তি দেয় আর অসত্য ও মিথ্যা মানুষকে ধর্ম করে।

সততা সম্পর্কে আমরা একটি আদর্শ কাহিনি

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন হ্যরত ওমর (রা)। তিনি তাঁর রাষ্ট্রের সর্বস্তরে ন্যায় বিচার করতেন। কোনো প্রকার অন্যায় কাজ হলে যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা নিতেন। ছোট-বড়, আপন-পর, ধনী-দরিদ্র সকলের জন্য সমান বিচার হতো। বিচারে কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব হতো না। তিনি রাতের অন্ধকারে ছদ্মবেশে মদিনার অলিতে-গলিতে ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের খোজখবর নিতেন। তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতেন।

এক রাতে তিনি মদিনার পথে ঘুরতে ঘুরতে একটি কুঁড়েঘরের কাছে আসলেন। ঐ ঘরে এক দরিদ্র মা ও তার মেয়ে বসবাস করতেন। তিনি মা ও মেয়ের কথাবার্তা শুনতে পেলেন। দুধ বিক্রি করে তাদের সংসার চলত। মা তার মেয়েকে সকালে দুধের সাথে পানি মিশিয়ে দুধের পরিমাণ বাড়াতে বলল। মেয়েটি তার মায়ের কথা শুনে অনুরোধ করে বলল, মা এটা অন্যায় কাজ। যদি খলিফা এই অন্যায় জানতে পারেন তাহলে কঠিন শাস্তি দিবেন। মা বললেন এ কাজ তো খলিফা বা তাঁর লোকজন দেখতে পারবে না। জানতেও পারবেন না। মেয়েটি তার মাকে বলল খলিফা ওমর বা তাঁর লোকজন এ অন্যায় না দেখতে পেলেও স্বয়ং আল্লাহতো সবকিছু দেখছেন। তাঁর চোখ কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না। তিনি সবকিছু দেখেন ও শোনেন।

হ্যরত ওমর (রা) মা ও মেয়ের এসব কথাবার্তা শুনে বাড়িতে ফিরে গেলেন। তিনি মেয়েটির সততায় খুবই খুশি ও মুগ্ধ হলেন। তিনি তাঁর যোগ্য ও সেহের পুত্রের সাথে ঐ দরিদ্র মহিলার সত্যবাদী কন্যার বিয়ে দিলেন। এই মেয়েটিই হলেন খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র)-এর নানি।

আমাদের মহানবি (স)-এর চরিত্রে এই সততা গুণটি পরিপূর্ণভাবে ছিল। তাঁর চরম শত্রুরাও এই সততার কারণে তাঁকে শুদ্ধার চোখে দেখত। তাঁর প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে যেদিন শত্রুরা

তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছিল সেদিনও তাঁর কাছে বহু লোকের অর্থ-সম্পদ আমানত ছিল। তিনি কারো কোনো অর্থসম্পদ আত্মসাহ করেননি। নষ্টও করেননি। আল্লাহর নির্দেশে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের সময় তিনি আমানতের সব অর্থ-সম্পদ হ্যরত আলী (রা)-এর কাছে রেখে গিয়েছিলেন। হ্যরত আলী (রা) সেগুলো নিজ নিজ মালিককে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এটাই সততার আদর্শ ও দৃষ্টান্ত।

পরিকল্পিত কাজ : সততা কাকে বলে, শিক্ষার্থীরা খাতায় সুন্দর করে বুঝিয়ে লিখবে।

পিতা-মাতার খেদমত

এই পৃথিবীতে পিতা-মাতার চেয়ে আপনজন আমাদের আর কেউ নেই। পিতামাতার ওছিলাতেই আমরা দুনিয়াতে এসেছি। তাঁদের স্নেহ ও আদরে আমরা লালিত-পালিত এবং বড় হয়েছি। তাঁরা ভালোবাসা ও মমতা দিয়ে আমাদের বড় করে তোলেন। শিশুকালে আমাদের মলমূত্র পরিষ্কার করেন। আমাদের অসুখ-বিসুখ হলে অনেক সেবাযত্ত করেন। আমাদের আনন্দে তাঁরা আনন্দ পান। আমাদের দুঃখ-কষ্টে তাঁরাও দুঃখ-কষ্ট পান। তাঁরা সব সময় আমাদের কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করেন। আমাদের সুস্থতা ও সুখ-সমৃদ্ধির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। এহেন হিতাকাঙ্ক্ষী পিতা-মাতার প্রতি আমাদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।

আমরা সবসময় পিতা-মাতার খেদমত করব। পিতা-মাতার সাথে ভাগো ব্যবহার করব। তাঁদের আদেশ-নিয়েধ শুনব এবং মেনে চলব। তাঁদের সম্মান দেখাব। তাঁদের সেবাযত্ত করব। তাঁরা অসুস্থ হলে সেবা করব। চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। তাঁরা যাতে সুখে-শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারেন, সেদিকে খেয়াল রাখব। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَبِالْأُولَاءِ الدِّينُ إِحْسَانًا

অর্থ: “তোমরা পিতা-মাতার সাথে সম্মত ব্যবহার কর।”

আমরা পিতা-মাতার মনে সামান্যতম কষ্ট দেব না। দুঃখ দেব না। তাঁদের সামনে গালিগালাজ করব না। তাঁদের কটু কথা বলব না এবং গালি দেব না। তাঁদের মন্দ বলব না। তিরক্ষার করব না। তাঁদের সাথে খারাপ ব্যবহার করব না। আমরা তাঁদের

সামনে বা অগোচরে এমন কথা বলব এবং এমন কাজ করব যা তাঁরা দেখলে বা শুনলে খুশি হন। তাঁরা খুশি হলে আল্লাহও আমাদের ওপর খুশি হবেন। মহানবি (স) বলেছেন-

رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ وَسَخْطُهُ فِي سَخْطِ الْوَالِدِ

অর্থ: পিতার সন্তুষ্টিতে প্রতিপালকের সন্তুষ্টি আর পিতার অসন্তুষ্টিতে প্রতিপালকের অসন্তুষ্টি।

পিতা-মাতা বৃন্দ হয়ে গেলে সন্তানের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ সময় যাতে তাঁদের সামান্যতম দুঃখ-কষ্ট ও অসুবিধা না হয়, সেদিকে সব সময় খেয়াল রাখব। তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য আল্লাহর ওয়াক্তে দান-খয়রাত করব। তাঁদের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর কাছে সর্বদা নিম্নোক্ত দোয়া করব:

رَبِّ ازْكُنْهُمَا كَمَارَبِّيْنِي صَغِيرًا

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! পিতা-মাতা আমাকে যেমন শৈশবে স্নেহ-যত্নে লালন-পালন করেছেন, আপনি তাঁদের প্রতি ঠিক তেমনি দয়া করুন।

এখন আমরা পিতা-মাতার খেদমতের ব্যাপারে একটি আদর্শ কাহিনী জানব :

হ্যরত বায়েজিদ বোস্তামী (র) ইরানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি তাঁর মাকে সব সময় খেদমত করতেন। সেবাযত্ন করতেন। তাঁর আম্মাও তাঁকে খুবই আদর-স্নেহ করতেন। একদা তাঁর আম্মা অসুস্থ ছিলেন। তিনি তাঁর পুত্রের কাছে পানি চাইলেন। পুত্র বায়েজিদ আশপাশে কোথাও পানি পেলেন না। অবশ্যে নদী থেকে পানি আনলেন। পানি নিয়ে আসতে একটু দেরি হয়েছে। তাঁর আম্মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। শীতের সময় ছিল তখন। বায়েজিদ (র) ভাবলেন আম্মাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে উঠালে তিনি কষ্ট পাবেন। তাঁর ঘুমের ব্যাধাত হবে, তাই তিনি সারারাত পানির পাত্র হাতে নিয়ে মায়ের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলেন। কনকনে শীত। শীতে তার হাত অবশ হয়ে আসছিল। কিন্তু তবু তিনি আম্মাকে ডাকলেন না। ঘুম ভাঙালেন না। দাঁড়িয়ে রইলেন।

শেষ রাতে আম্মার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। শিয়রে তাঁর ছেলেকে পানির পাত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তিনি অবাক হলেন এবং খুব খুশি হলেন। তিনি প্রাণভরে ছেলের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। আল্লাহ মায়ের দোয়া করুল করলেন। পরবর্তীতে ছেলেটি আল্লাহর বিশ্ববিখ্যাত ওলি বায়েজিদ বোস্তামী নামে

পরিচিত হলেন। আর মাতৃভক্তি ও নৈতিক মূল্যবোধের একটি উজ্জ্বল দ্রষ্টান্ত।



অসুস্থ মায়ের শিয়রে পানি হাতে সন্তান

এভাবে পিতা-মাতার খেদমত করলে আগ্নাহৰ রহমত লাভ করা যায়। পিতা-মাতার খেদমত ও সেবাযত্তের মধ্যে রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের চরম সুখশান্তি। মহানবি (স) বলেছেন,

الْجَنَّةُ تَحْتُ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ

অর্থ: “মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত।”

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা পিতা-মাতার খেদমত সম্পর্কে জানবে। পরস্পর আলোচনা করবে এবং খাতায় লিখবে।

শ্রমের মর্যাদা

শ্রম অর্থ মেহনত, পরিশ্রম, চেষ্টা, খাটুনি। আমরা সবাই শ্রম দিই। চেষ্টা করি, কেউ চাকরিতে শ্রম দিই, কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য শ্রম দিই। কেউ চাষাবাদে শ্রম দিই। কেউ লেখাপড়ায় শ্রম দিই। কেউ খেলাধুলায় শ্রম দিই। চেষ্টা ও শ্রম সাফল্যের চাবিকাঠি।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

অর্থ : “মানুষ যা চেষ্টা করে তাই পায়।”

একটি ঘটনা

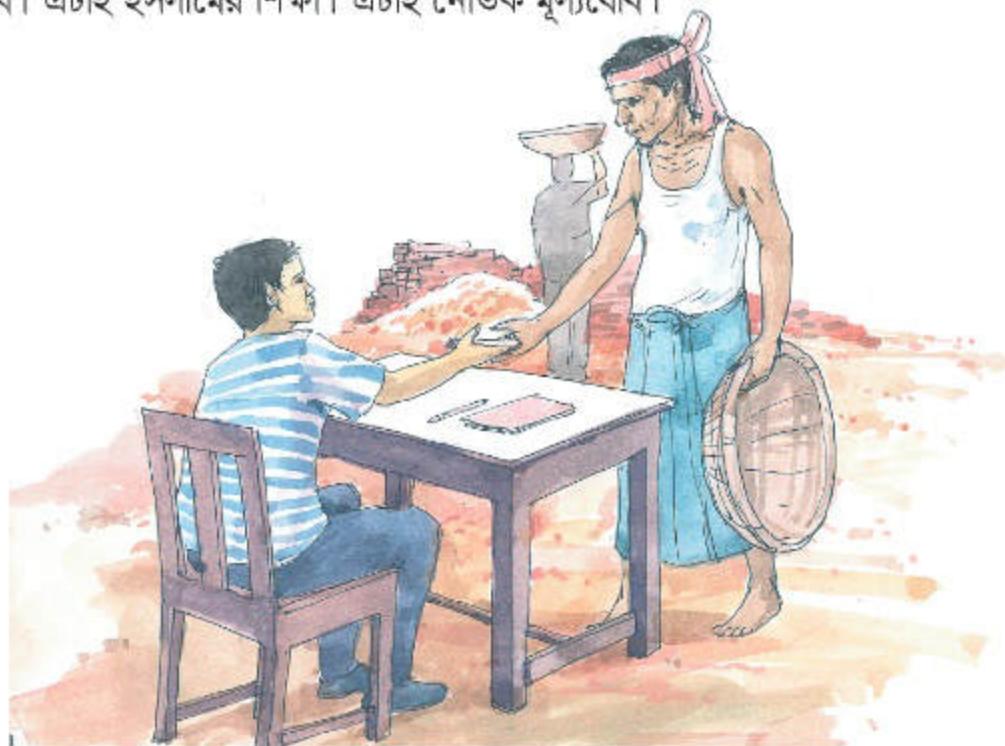
ফুরাদ পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। সে রোজ সকালে ঘূম থেকে ওঠে। মেসওয়াক করে। হাতমুখ ধুয়ে ওঝু করে ফজরের সালাত আদায় করে। এরপর কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করে। অতঃপর তার আশুর কাছে পড়তে বসে। সে প্রতিদিনের পড়া তৈরি করে নিয়ে কুলে ঘায়। শিক্ষক ক্লাসে পড়ার মধ্য থেকে তাকে কোনো প্রশ্ন করলে সে দাঁড়িয়ে উভর দেয়। শিক্ষক তার ওপর খুব খুশি হন। শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন, তোমরা পড়াশোনায় শ্রম ও মনোযোগ দিলে সবাই পড়া শিখতে পারবে। প্রশ্নের উভর দিতে পারবে। চেষ্টা ও পরিশ্রমই শেখার ও জানার চাবিকাঠি।

আমরা অনেক সময় কাজ করতে গিয়ে লজ্জাবোধ করি। মনে করি যে, কাজ করলে লোকে ঘৃণা করবে। চাকর বলবে। কিন্তু এ রকম মনে করা ঠিক নয়। কারণ আমরা সবাই শ্রম দিই। আমরা সকলে শ্রমিক। দেশের ছোট-বড় শিক্ষিত, অশিক্ষিত সবাই শ্রম দেন এবং বিনিময়ে অর্থ উপাজন করেন। তাই কোনো শ্রম বা শ্রমিককে ঘৃণা করতে নেই। প্রত্যেক শ্রমিককে তার শ্রমের মর্যাদা দিতে হবে। তাকে শুন্দৰ করতে হবে। তাকে সেহ ও আদর করতে হবে।

আমাদের মহানবি (স) সব সময় নিজের কাজ নিজে করতেন। তিনি কখনো কাজে অবহেলা করতেন না। কোনো কাজকে ঘৃণা করতেন না। কাজ ফেলে রাখতেন না। অপরের কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। তিনি ছেঁড়া জামা-কাপড় নিজেই সেলাই করতেন। ময়লা জামা-কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার করতেন। ঘর বাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করতেন। পানাহারের প্রেট-গ্লাস নিজেই ধূতেন। বাসায় মেহমান এলে তাকে ঘৃন্ত করতেন। তিনি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মতো নিজ হাতে সব কাজ করতেন। আনন্দ পেতেন। মহানবি (স) গৃহকর্মীদের সম্পর্কে বলেছেন, ‘যারা কাজ করে, তারা তোমাদের ভাই। নিজে যা খাবে, তাদের তা খাওয়াবে। নিজে যা পরিধান করবে, তাদেরও তা পরতে দেবে। কাজকর্মে তাদের সাহায্য করবে। তাদের বেশি কষ্ট দেবে না। তাদের মর্যাদা করবে। তাদের শ্রমের মর্যাদা দেবে।’

আমাদের অনেকের বাসায় গরিব অসহায় লোকজন ও মহিলারা নানা রকম কাজকর্ম করে থাকে। ছোট ছোট বিভিন্ন বয়সের গরিব ছেলেমেয়েরা কাজকর্ম করে। আমরা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করব। কাজের লোকজন বয়সে বড় হলে তাদের সালাম দেব। সম্মান করব। মর্যাদা দেব। আর বয়সে ছোট হলে তাদের আদর করব। যত্ন নেব। নিজেরা যা খাব, তাদেরও তাই খেতে দেব। তাদের কাজে সাহায্য করব। তাদের কোনো কষ্ট দেব না। তাদের দুঃখ দেব না। তারা আমাদের মতো মানুষ। তারা আমাদের ভাইবোন। আমাদের যেমন মানমর্যাদা আছে, তাদেরও তেমনি মানমর্যাদা আছে। আমরা তাদের সম্মান করব। তাদের কাজের ও শ্রমের মর্যাদা দেব। আর এই শ্রমের মর্যাদা দেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

পৃথিবীতে কোনো কাজই তুচ্ছ নয়। কোনো কর্মী ও শ্রমিক নগণ্য নয়। প্রত্যেক কর্মী ও শ্রমিকের হাতই উত্তম হাত। শ্রমের উপার্জনই উত্তম উপার্জন। শ্রমিকের কাজ শেষ হলে তার পারিশ্রমিক সাথে সাথেই দিয়ে দেওয়া উচিত। তাহলে শ্রমের ন্যায্য মর্যাদা দেওয়া হবে। এটাই ইসলামের শিক্ষা। এটাই নৈতিক মূল্যবোধ।



চিত্র : শ্রমিকের মজুরি প্রদান করা হচ্ছে

পরিকল্পিত কাজ : আমরা নিজেদের কাজ নিজেরা করলে আমাদের মর্যাদা বাড়বে, না কমবে? শিক্ষার্থীরা এ প্রশ্নের উত্তরটি খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

মানবাধিকার ও বিশ্বভাত্ত

মানুষের অধিকারকে মানবাধিকার বলা হয়। মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ একাকী বসবাস করতে পারে না। ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বৃদ্ধ-যুবক ও শিশু সবাই একসাথে বসবাস করে। আবার এদের মধ্যে অনেকে পঙ্গু, বিকলাঙ্গ ও ইয়াতীম। এরা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত থাকে। এসব মানুষের অধিকার রয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে পৃথিবীর সব মানুষ এক ও অভিন্ন। ভাষা, বর্ণ, বংশ ও অঞ্চলবিশেষে মানুষের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও সবাই মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত। মানুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। সকলেই সমান। সকলের সমান অধিকার রয়েছে। ইসলাম সকল মানুষের ন্যায্য অধিকার দান করেছে।

ইসলামপূর্ব যুগে মানুষ বেচাকেনা হতো। তারা কেনা গোলামের ওপর নির্মম অত্যাচার করত। কেনা গোলামের কোনো স্বাধীনতা ছিল না। সে বেতনও পেত না। মালিকের খেয়াল-খুশিমতো তাকে চলতে হতো। মালিক তার ওপর নির্মম অত্যাচার করলেও সে কোনো প্রতিবাদ করতে পারত না। সব অত্যাচার সহ্য করতে হতো। এহেন কেনা গোলামের সাথে মহানবি (স) এবং সাহাবিগণ অত্যন্ত মধুর আচরণ করেছেন। হ্যরত বেলাল (রা) এবং আরও অনেক কেনা গোলামকে তাঁরা মুক্ত করে দিয়েছিলেন। হ্যরত যায়দ (রা) ছিলেন হ্যরত খাদিজা (রা)-এর কেনা গোলাম। মহানবি (স) তাঁকে নিজ পুত্রের ন্যায় মেহ করতেন এবং তাঁকে সেনাপতির পদ দান করেছিলেন। এভাবে ইসলাম মানবাধিকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আর এটাই নেতৃত্ব মূল্যবোধের অবিস্রান্ত ইতিহাস।

মানবাধিকার সম্পর্কে একটি আদর্শ কাহিনি

একদিন মহানবি (স) দেখলেন যে, রাস্তার ওপর একটি বালক শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে। তার পরনে ছিল ছেঁড়া নোংরা জামা-কাপড়। মাথায় ছিল ভারী লাকড়ির বোঝা। তাকে দেখে মহানবি (স)-এর মনে দয়া হলো। তিনি বালকটিকে জিজাসা করে জানতে পারেন যে বালকটির পিতা-মাতা নেই। সে রোজ জঙ্গল থেকে লাকড়ি কুড়িয়ে আনে। আর তা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। বালকটির কফ্টের কাহিনি শুনে মহানবি (স)-এর

চোখ দিয়ে অশু ঝরতে লাগল। তিনি বালকটিকে আদর করলেন এবং তাকে সাথে নিয়ে
বাড়িতে আসলেন। তিনি বালকটিকে হ্যারত খাদিজা (রা)-এর কাছে দিয়ে বললেন,
'বালকটি ইয়াতীম, তুমি একে স্বীয় পুত্রের ন্যায় মেহযত্ন দিয়ে লালন-পালন করবে।'
মহানবি (স) এভাবে বালকটিকে আশ্রয় দিয়ে মানবাধিকারের আদর্শ স্থাপন করেছেন।

পৃথিবীর সকল মানুষের আদি পিতা হ্যারত আদম (আ) এবং মাতা হাওয়া (আ)। আমরা
সকলে আদম (আ) এবং হাওয়া (আ)-এর সন্তান। অতএব আমরা সকল মানুষ ভাই
ভাই। মানব জাতি হ্যারত আদম (আ)-এর বংশধর। আস্তে আস্তে এই মানবজাতি
পৃথিবীর সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং বসবাস করছে। এদের আকৃতি ও বর্ণ ভিন্ন
ভিন্ন। তবুও এরা ভাই ভাই। বিশ্বের সকল মানুষ ভাই ভাই। এরা সবাই আদম (আ) হতে
সৃষ্টি।

আমরা বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল ভেদাভেদ ও কলহ-বিবাদ ভুলে যাব। বিশ্বের সবাই ভাই
ভাই হিসেবে মিলেমিশে বসবাস করব। সকল দুর্নীতি ও বৈষম্য দূর করে বিশ্বভাত্তত্ব
বন্ধনে আবদ্ধ হব। আর কোনো হিংসাবিদ্যে করব না। কারো কোনো অনিষ্ট করব না।
একে অপরের উপকার করব।

মহানবি (স) বলেছেন, 'তোমরা প্রত্যেকে আদম (আ) হতে, আর আদম (আ) মাটি হতে (সৃষ্টি)।'

আমরা বিশ্বভাত্তত্ব গড়ব। মানবাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করব। সোনার বাংলাদেশ গড়ব। এটা
আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা মানবাধিকার এবং বিশ্বভাত্তত্ব সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা
খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

পরিবেশ

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে এই সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা, মাটি, পানি, বায়ু, পাহাড়-পর্বত এ সবকিছুই আমাদের পরিবেশের অংশ এগুলোকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলা হয়। তা ছাড়া ঘরবাড়ি, মসজিদ, মন্দির, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট ইত্যাদি সামাজিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো মানুষ তৈরি করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য এসব পরিবেশের প্রয়োজন।

পরিবেশ সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ পরিবেশ আমাদের ভারসাম্য রক্ষা করে। বড় বড় গাছ কেটে আমরা দরজা, জানালা, ঘরের আসবাবপত্র ইত্যাদি তৈরি করি। তা ছাড়া লাকড়ি হিসেবেও ব্যবহার করি। পশুপাখির মাংস আমরা খাই। গাভী আমাদের দুধ দেয়। আমাদের সুস্থ শরীরের জন্য বায়ুর প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে আমরা লেখাপড়া করি। মসজিদে আমরা ইবাদত করি। সালাত আদায় করি। পুরুর নদী ও জলাশয় থেকে আমরা মাছ পাই। রাস্তাঘাট আমাদের চলাচলের প্রধান ব্যবস্থা। মাঠে আমরা খেলা করি। এ জন্য পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা পরিবেশ সংরক্ষণ করব। পরিবেশ সংরক্ষণ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোভূম। মানুষের দায়িত্ব পরিবেশ সংরক্ষণ করা। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়।

- ক) বৃক্ষ গ্রোপণ করতে হবে। বিনা প্রয়োজনে বৃক্ষ নিধন করা যাবে না। গাছের ডালপালা ভাঙা যাবে না। গাছের পাতা ছেঁড়া, নষ্ট করা যাবে না।
- খ) অকারণে পশুপাখি ও কীটগতজা হত্যা করা যাবে না।
- গ) যেখানে-সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করা যাবে না।
- ঘ) যেখানে-সেখানে কক, ধূথু এবং ময়লা-আবর্জনা ফেলা যাবে না। নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে।
- ঙ) গাড়ি ও কলকারখানার ধোয়া পরিবেশ দূষিত করে। তাই যেখানে-সেখানে কলকারখানা নির্মাণ করা যাবে না।

- চ) পুকুরে গরু-মহিষ গোসল করালে পানি দুর্গন্ধ ও দূষিত হয়। এতে পরিবেশ নষ্ট হয়। তাই পুকুরে গরু-মহিষ গোসল করানো যাবে না।
- ছ) ঘরবাড়ি, বিদ্যালয়, খেলার মাঠ ও রাস্তাঘাট সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

প্রাকৃতিক কোনো দুঃটিনা বা বিপর্যয় যখন কোনো জনপদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে তোলে, তখন তাকে আমরা বলি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হঠাতে করে আসে। এর ওপর সাধারণত মানুষের কোনো হাত থাকে না। যেমন বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, জলোচ্ছাস, নদীভাঙ্গন, সুনামি, খরা, ভূমিকম্প ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দেশের অনেক ক্ষতি হয়। যেমন, জলোচ্ছাসের কারণে উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে সমুদ্রের লোনা পানি ঢুকে যায়। ফলে গাছপালা, মৎস্যখামার ও শস্যক্ষেত্রের অনেক ক্ষতি হয়। জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি হয়। কৃষিজমির ক্ষতি হয়। জমির উর্বরা শক্তি কমে যায়। কৃষি উৎপাদন কমে যায়।



সিডর ও আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত জনপদ

কারণে আমাদের অনেক প্রাণহানি হয়েছে। অনেক সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। খাওয়ার পানির খুব অভাব দেখা দিয়েছিল। সুন্দরবনের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ অংশ বন নষ্ট হয়েছে। নানা প্রকার মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হয়েছে। বন্যা, খরা ও ভূমিকঙ্গের ফলে অনেক ঘরবাড়ি নষ্ট হয়। মানুষের বেঁচে থাকা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। এ সময় আমরা



গাছের শিকড় দ্বারা মাটির ক্ষয়রোধ

সেবা-শুশুষার মতো কার্যক্রম চালাব। এসব ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে ঢাঁড়াব। যেতাবে পারি তাদের সেবা, সহায়তা করব। এটাই হলো ইসলাম ও নৈতিকতার শিক্ষা।

বাংলাদেশের লোকজন যুগ যুগ ধরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে লড়াই করে বেঁচে আছে।

আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য নিম্নোক্ত কৌশলগুলো অবলম্বন করব:

- ক) যথাসম্ভব উচু জায়গায় বসতভিটা, গোয়ালঘর ও ইঁসমুরগির ঘর তৈরি করব।
- খ) ঘরের ভেতরে উচু মাচা তৈরি করে তার উপর খাদ্যশস্য, বীজ ইত্যাদি সংরক্ষণ করব।
- গ) পুরুরের পাড় উচু করব। টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিন যথাসম্ভব উচু স্থানে বসাব।
- ঘ) শুকনো খাবার যেমন চিড়া, মুড়ি, গুড় এবং প্রয়োজনীয় ওযুথ ঘরে মজুদ রাখব।
- ঙ) পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে সাঁতারকাটা শেখাব।
- চ) বন্যার সময়ে যাতায়াতের জন্য নৌকা না থাকলে কলাগাছের ভেগ তৈরি করে নেব।

এগুলো করলে আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাব। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে নিজে রক্ষা পাওয়া এবং অপরকে রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

পরিকল্পিত কাজ :

- ক) শিক্ষার্থীরা পরিবেশ সংরক্ষণের উপায়গুলো খাতায় লিখবে।
- খ) শিক্ষার্থীরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষার কৌশলগুলো খাতায় লিখবে।

ଅନୁଶୀଳନୀ

ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ :

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ছিঃ (✓) দাও:

১. আখলাক অর্থ কী?

২. আমরা বেকার লোকদের কিসের ব্যবস্থা করে দেব?

- ক) কাজের খ) সেবার

- গ) মুক্তির ঘ) বন্দের

৩. দেশপ্রেম অর্থ কী?

৪. মহানবি (স) কোথায় হিজরত করেছিলেন?

- ক) কুফার খ) তায়েফে

৫. মানুষ অন্যায় করার পর অনুতঙ্গ হলে আল্লাহ তাকে কী করেন?

৬. ভালো কাজে একে অপরকে কী করবে?

- | | |
|--------------|------------------|
| ক) ধরক দেবে | খ) মারবে |
| গ) শাসন করবে | ঘ) সহযোগিতা করবে |

৭. সততা মানে কী?

- | | |
|--------------|-------------|
| ক) ধৈর্যধারণ | খ) সরলতা |
| গ) সাধুতা | ঘ) বিরোধিতা |

৮. হয়েত বায়েজিদ বোস্তামী (র) কোথাকার অধিবাসী ছিলেন?

- | | |
|---------|------------|
| ক) ইরান | খ) ইরাক |
| গ) মিশর | ঘ) লিবিয়া |

৯. মানুষ যা চেষ্টা করে তাই পায়, এটি কার উক্তি?

- | | |
|------------------|-------------|
| ক) মানুষের | খ) ফেরেশতার |
| গ) মহানবি (স)-এর | ঘ) আল্লাহর |

১০. মানুষের অধিকারকে কী বলা হয়?

- | | |
|-------------|---------------|
| ক) মানবতা | খ) মানবাধিকার |
| গ) মানবধর্ম | ঘ) মানব জাতি |

১১. প্রাকৃতিক পরিবেশ কোনটি?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক) জানালা | খ) দালান |
| গ) দরজা | ঘ) গাঢ়পালা |

১২. কোনটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়?

- | | |
|---------------|--------------|
| ক) বন্যা | খ) ভূমিকম্প |
| গ) অগ্নিকাণ্ড | ঘ) ঘূর্ণিঝড় |

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর

- ১) যার আচরণ ভালো সে সকলের সাথে ভালো ----- করে।
- ২) মানুষ আল্লাহর সকল সৃষ্টির প্রতি ----- দেখাবে।
- ৩) দেশপ্রেম ----- অঙ্গ।
- ৪) হিজরতের সময় মহানবি (স) তাঁর জন্মভূমি ----- অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছিলেন।
- ৫) সতত মানুষকে ----- দেয়।
- ৬) মায়ের --- নিচে সন্তানের জান্মাত।
- ৭) চেষ্টা ও শ্রম ----- চাবিকাঠি।

গ. বাম পাশের শব্দগুলোর সাথে ডান পাশের শব্দগুলো মিলাও:

বাম	ডান
১) তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই লোক, যার চরিত্র	দয়া দেখান না
২) যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া দেখায় না আল্লাহ তার প্রতি	পূরক্ষার রয়েছে
৩) আমাদের জন্মভূমির নাম	ময়লা ফেলব
৪) যে ক্ষমা করল তার জন্য আল্লাহর কাছে	সহযোগিতা করবে
৫) আমরা সকলে ডায়টবিনে	সবচেয়ে সুন্দর
৬) তোমরা ভালো কাজে একে অপরকে	বাংলাদেশ

ঘ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. মহানবি (স) সুন্দর চরিত্র সম্পর্কে কী বলেছেন?
২. ‘সৃষ্টির সেবা’ কাকে বলে?
৩. মহানবি (স) মক্কাবাসীদের কিসের আহ্বান জানিয়েছিলেন?

৪. ক্ষমাশীল ব্যক্তি কে?
৫. মন্দ কাজ কাকে বলে?
৬. যার মধ্যে সততা আছে, তাকে কী বলে?
৭. আমরা পিতা-মাতার সাথে কীরূপ ব্যবহার করব?
৮. আমরা পিতা-মাতার জন্য কী বলে দোয়া করব?
৯. আমরা বাসার কাজের লোকদের সাথে কীরূপ ব্যবহার করব?
১০. মহানবি (স) শ্রমিকদের পারিশুমির সম্পর্কে কী বলেছেন?
১১. মানব জাতির আদিপিতা ও আদিমাতা কে কে ছিলেন?
১২. প্রাকৃতিক পরিবেশ কাকে বলে?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন:

১. আমরা কোন কোন মন্দ আচরণ থেকে দূরে থাকব?
২. আমরা কীভাবে মানুষের সেবা করব?
৩. কী কী উপায়ে দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা যায়?
৪. মহানবি (স) এর জীবনের ক্ষমার একটি আদর্শ কাহিনি উল্লেখ কর।
৫. আমরা ভালো কাজে কীভাবে সাহায্য করব?
৬. মন্দ কাজ সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন?
৭. হ্যান্ড উমর (রা)-এর সততার পরিচয় দাও।
৮. আমরা পিতা-মাতার খিদমত করব কেন?
৯. মহানবি (স) গৃহকর্মীদের সম্পর্কে কী বলেছেন?
১০. প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমরা কী কী কৌশল অবলম্বন করব?

চতুর্থ অধ্যায়

কুরআন মজিদ শিক্ষা

কুরআন মজিদের পরিচয়

কুরআন মজিদ আল্লাহ তায়ালার কালাম। কালাম অর্থ বাণী। আল্লাহ তায়ালা এই কালাম মহানবি (স)-এর কাছে নাজিল করেন। আমাদের মহানবি (স) হলেন সর্বশেষ নবি ও রাসূল। আর কুরআন মজিদ হলো সর্বশেষ আসমানি কিতাব।

পবিত্র কুরআন যেমন নাজিল হয়েছিল, তেমনি আছে। এ কিতাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি, আর কোনো দিন কোনো প্রকার পরিবর্তন হবেও না।

আল্লাহ পাক বলেন, আমি কুরআন মজিদ নাজিল করেছি আর এর হেফাজতকারীও আমি।

মানুষের ভালো হওয়ার এবং কল্যাণ লাভের সব কথা, সব নিয়ম-নীতি আল্লাহ পাক কুরআন মজিদে ঘোষণা করেছেন। কুরআন মজিদ তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য হলো চারটি।

১. সহিহ-শুন্দ্রভাবে তিলাওয়াত করা
২. এর অর্থ বোঝা
৩. আল্লাহ পাক যা আদেশ করেছেন তা পালন করা
৪. আল্লাহ পাক যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা

মহানবি (স)-এর সাথীগণ এ উদ্দেশ্যগুলো সামনে রেখে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করতেন। আর এতে যা নির্দেশ রয়েছে তা পুরোপুরি মেনে চলতেন এবং যা করতে নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকতেন। ফলে তাঁরা পৃথিবীর নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

একক কাজ : শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকেই কুরআন মজিদ তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য কী এর একটি তালিকা তৈরি করবে। এরপর মার্কার দিয়ে পোস্টার পেপারে সুন্দর করে লিখবে।

বুঝে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করলে আমরা জানতে পারব আল্লাহ তায়ালার পরিচয়, নবি-রাসূলগণের পরিচয়, ফেরেশতাগণের পরিচয় ও পরকালের পরিচয়। আমরা আরো জানতে পারব আমাদের সৃষ্টিকর্তা কে। আমাদের রিজিকদাতা কে। কে আমাদের পালনকর্তা। কে সর্বশক্তিমান। কে সবকিছুর মালিক। কে পরম দয়ালু। কে একমাত্র শান্তিদাতা।

আমরা আরও জানতে পারব আমাদের কাজকর্ম কীরূপ হওয়া উচিত। আমাদের চরিত্র কীরূপ হওয়া দরকার। আমরা এ দুনিয়ায় কার হুকুম মানব আর কার হুকুম মানব না। কিসে আমাদের সম্মান ও সফলতা আর কিসে আমাদের ব্যর্থতা ও লাঞ্ছন।

পরিকল্পিত কাজ : কুরআন মজিদ বুঝে তিলাওয়াত করলে কী কী জানতে পারব তার একটি তালিকা শিক্ষার্থীরা তৈরি করবে।

তাজবিদ (التجويد)

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। কুরআন মজিদের ভাষা আরবি। সঠিক উচ্চারণে আমাদের কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করা শিখতে হবে। সঠিক উচ্চারণে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করলে আল্লাহ তায়ালার কালামের অর্থ ঠিক থাকে। সালাত শুন্দর হয়। সঠিক ও শুন্দরভাবে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করতে না পারলে আল্লাহর কালামের অর্থ ঠিক থাকে না। সালাত শুন্দর হয় না। পাপ হয়।

শুন্দরভাবে কুরআন মজিদ তিলাওয়াতের নিয়মকে তাজবিদ বলে। তাজবিদে থাকে মাখরাজ, ইদগাম, গুন্নাহ ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ।

মাখরাজ (المخرج)

আরবি শব্দ উচ্চারণের সময় মুখের এক এক জায়গা থেকে এক একটি হরফ উচ্চারিত হয়। কখনো জিহ্বা, কখনো তালু, কখনো দাঁত, কখনো ঠোঁট, কখনো কঢ়নালি- নানা স্থান থেকে হরফ উচ্চারণ করা হয়।

আরবি হরফ উচ্চারণের স্থানকে বলে মাখরাজ। কোনো হরফকে সাকিন করে ডানে একটি হরতকবিশিষ্ট আলিফ বসিয়ে উচ্চারণ করলে সাকিন হরফটির আওয়াজ যে স্থানে

গিয়ে থেমে যায় তা হলো এই হরফের মাখরাজ বা উচ্চারণের স্থান। যেমন—

১. **ଆ** = আলিফ বা যবর আব। এখানে বা বর্ণের উচ্চারণের সময় আওয়াজ দুই ঠোটে এসে থেমে গেছে। কাজেই **ବ** বর্ণের মাখরাজ দুই ঠোট।

২. **ଖ** = আলিফ থা যবর আখ। এখানে **ଖ** বর্ণের উচ্চারণে আওয়াজ থেমে গেছে কঠনালিতে। কাজেই **ଖ** বর্ণের মাখরাজ কঠনালি। এমনিভাবে আরবি ২৯টি বর্ণ ১৭টি স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। এই স্থানগুলো হলো নাসাগহুর, মুখগহুর, জিহ্বা, তালু, আলজিহ্বা, কঠনালির শুরু, কঠনালির মধ্যভাগ, কঠনালির শেষ অংশ, উপরের ঠোট, সামনের উপরের দুটি দাঁত, সামনের নিচের দুটি দাঁত, ডান দিকের উপরের মাড়ির দাঁত, বাম দিকের উপরের মাড়ির দাঁত ইত্যাদি।

১. কঠনালির শুরু থেকে উচ্চারিত হয় **ଙ**—**୧**

২. কঠনালির মাঝখান থেকে উচ্চারিত হয় **ଚ**—**୨**

৩. কঠনালির শেষ অংশ থেকে উচ্চারিত হয় **ଖ**—**୩**

৪. জিহ্বার গোড়া তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় **ତ**

৫. জিহ্বার গোড়ার কিছুটা সামনের অংশ তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় **କ**

৬. জিহ্বার মধ্যভাগ তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় **ଜ**—**ଶ**—**ଇ**।

৭. জিহ্বার গোড়ার কিনারা, উপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় **ଚ**

৮. জিহ্বার অগ্রভাগের কিনারা সামনের উপরের দাঁতের সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত
হয় ।
৯. জিহ্বার অগ্রভাগ তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় ॥
১০. জিহ্বার অগ্রভাগের পিঠ তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় ।
১১. জিহ্বার অগ্রভাগ উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়
- ট ড ত
১২. জিহ্বার অগ্রভাগ সামনের উপরের দুই দাঁতের অগ্রভাগে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়
- ঢ ঝ ঞ
১৩. জিহ্বার অগ্রভাগ সামনের উপরের দুই দাঁতের শেষভাগে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়
- স স র
১৪. নিচের ঠোটের ভেজা অংশ সামনের উপরের দুই দাঁতের সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত
হয় ।
১৫. দুই ঠোট থেকে উচ্চারিত হয় ।
১৬. মুখের খালি জায়গা থেকে মাদ-এর হরফ উচ্চারিত হয়
- ب ب
১৭. নাকের গহ্বর থেকে গুন্নাহ উচ্চারিত হয় ।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা কোন কোন স্থান থেকে আরবি ২৯টি বর্ণ উচ্চারিত
হয় তা দলে আলোচনা করে একটি তালিকা তৈরি করবে। এরপর মার্কার দিয়ে
গোস্টার পেপারে লিখবে।

ওয়াক্ফ বা বিরামচিহ্ন

কুরআন মজিদ শুধু তিলাওয়াতের জন্য আয়াতের মধ্যে কয়েক থকারের বিরামচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। এ চিহ্নগুলোর দ্বারা কোথায় থামতে হবে, কোন জায়গায় কিছুটা শ্বাস নেওয়া যাবে, তা নির্দেশ করা হয়েছে। এ বিরামচিহ্নকে ওয়াক্ফ বলা হয়।

বিরামচিহ্ন দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো, একজন আরবি না জানা লোকও যেন সহজে বোঝতে পারেন কোথায় কতটুকু থামতে হবে আর কোথায় থামলে অর্থ ঠিক থাকবে না। আগে কুরআন মজিদে এই চিহ্নগুলো দেওয়া ছিল না। যিনি সর্বপ্রথম এ চিহ্নগুলো ব্যবহার করেন তার নাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে তাইফুর।

ওয়াক্ফ বা বিরামচিহ্নের বিবরণ:

- = একে ‘ওয়াক্ফ তাম’ বলে। আয়াতের শেষে এ চিহ্ন থাকে। যেখানে শুধু এ চিহ্ন থাকে সেখানে আমরা অবশ্যই থামব। কিন্তু এর উপর অন্য কোনো চিহ্ন থাকলে তখন আমরা সে অনুযায়ী আমল করব।
- ৠ = একে ‘ওয়াক্ফ লাজিম’ বলে। এরূপ চিহ্নিত স্থানে ওয়াক্ফ করা আবশ্যিক, না করলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থ বিকৃত হয়ে যেতে পারে।
- ্ঠ = একে ‘ওয়াক্ফ মুতলাক’ বলে। এরূপ চিহ্নিত স্থানে বিরতি উত্তম।
- ্জ = একে ‘ওয়াক্ফ জায়েজ’ বলে। এখানে থামা ও না থামা উভয় অনুমতি আছে। তবে থামাই ভালো।
- ্ঝ = একে ‘ওয়াক্ফ মুজাওয়াজ’ বলে। এখানে না থামাই ভালো।
- ্স = একে ‘ওয়াক্ফ মুরাখখাস’ বলে। এরূপ চিহ্নিত স্থানে না থেমে মিলিয়ে পড়া ভালো। তবে দমে না কুলালে থামা যায়।

ق = এখানে থামার ব্যাপারে মতভেদ আছে। থামবে না।

ف = এখানে থামা উচিত।

ل = এখানে থামা যাবে না। আয়াতের মাঝখানে থাকলে থামা যাবে না। আর আয়াতের শেষে গোল চিহ্নের ওপর থাকলে থামা যাবে।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে ওয়াকফ বা বিরাম চিহ্নের বিবরণসহ একটি তালিকা তৈরি করে পোস্টার পেপারে লিখবে।

গুনাহ **الْغَنَّةُ**

কুরআন মজিদ সহীহ-শুন্দরভাবে তিলাওয়াতের একটি নিয়ম হলো গুনাহ। নাক ব্যবহার করে উচ্চারণ করাকে গুনাহ বলে।

আরবি হরফ ২৯টি। এর মধ্যে গুনাহর হরফ ২টি। **م** (মিম), **ن** (নুন)। এই হরফ দুটি যখন তাশদীদযুক্ত হয়, তখন তার উচ্চারণ স্বরকে নাকের বাঁশির মধ্যে নিয়ে গুন গুন করে উচ্চারণ করতে হয়। গুনাহ করা ওয়াজিব। গুনাহর স্থলে কমপক্ষে এক আলিফ পরিমাণ লম্বা করতে হয়। যেমন,

إِنْ (ইন্না), **عَمَّ** (আমমা), **ثُمَّ** (সুমমা) ইত্যাদি।

কুরআন মজিদ তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে গুনাহর গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা তিলাওয়াতের সময় যথাস্থানে গুনাহ করব।

সূরা ফীল (سُورَةُ الْفِيلِ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম দয়াময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

মাকি সূরা, আয়াত সংখ্যা- ৫

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحِبِ الْفِيلِ ۝ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طِيرًا أَبَا إِيْلَ ۝ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ ۝ فَجَعَلْهُمْ كَعَصْفِ

مَأْكُولٍ ۝

বাংলা উচ্চারণ:

১. আলাম তারা কাইফা ফায়ালা রাকুকা বিআসহাবিল ফীল।
২. আলাম ইয়াজয়াল কাইদাহুম ফি তাদলিল।
৩. ওয়া আরসালা আলাইহিম তায়রান আবাবিল।
৪. তারমিহিম বিহিজারাতিম মিন সিজিল।
৫. ফাজায়ালাহুম কাআসফিম মা'কুল।

- অর্থ :**
১. তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক হাতিওয়ালাদের প্রতি কী করেছিলেন ?
 ২. তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থ করে দেননি ?
 ৩. তাদের বিরুন্দে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন।
 ৪. যারা তাদের ওপর কঞ্চর নিষ্ফেপ করে।
 ৫. এরপর তিনি তাদের চর্বিত ঘাসের মতো করে দেন।

সূরা কুরায়শ (قُرْيَشٌ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

পরম দয়াময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

মাক্কি সূরা, আয়াত সংখ্যা- ৪

لَا يُلْفِ قُرْيَشٌ فِيهِمْ رِحْلَةُ الشِّتَاءِ وَالصَّيفِ فَلَيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا

الْبَيْتِ ۝ الَّذِي أَطْعَنَهُمْ مِنْ جُنُعٍ ۝ وَأَمَّنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝

বাংলা উচ্চারণ:

১. লি ইলাফি কুরাইশীন।
২. ইলাফিহিম রিহলাতাশ শিতায়ি ওয়াসসায়িফ।
৩. ফালইয়াবুদু রাববা হাজাল বাইত।
৪. আল্লাজি আতয়ামাহুম মিন জুয়ে ওয়া আমানাহুম মিন খাউফ।

অর্থ : ১. যেহেতু কুরাইশদের আসক্তি আছে।

২. আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের।
৩. তারা ইবাদত করুক এই গৃহের প্রতিপালকের।
৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে তাদের নিরাপদ রেখেছেন।

سُورَةُ الْمَاعُونِ (سূরা মাঁ'উন)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়াময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

মাক্কি সূরা, আয়াত সংখ্যা- ৭

أَرْعَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالرِّيْدِينَ ۝ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيْمَ ۝ وَلَا يَحْفُظُ

عَلَى ظَعَامِ الْيَسِيْكِيْنِ ۝ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنِ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ

سَاهُونَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَأْءُونَ ۝ وَيَنْتَعُونَ الْمَاعُونَ ۝

বাংলা উচ্চারণ:

১. আরাইতাল্লায়ি ইউকাজিবুবিনীন। ২. ফাজালিকাল্লায়ি ইয়াদুউল ইয়াতীম। ৩. ওয়ালা ইয়াহুদু আলা তায়ামিল মিসকীন। ৪. ফাওয়াইলুল্লিল মুসাল্লীন। ৫. আল্লায়িনা হুম আন সালাতিহিম সাহুন। ৬. আল্লায়িনা হুম ইউরাউন। ৭. ওয়া ইয়ামনাউনাল মাঁ'উন।

অর্থ : ১. তুমি কি দেখেছ তাকে যে দীনকে প্রত্যাখ্যান করে?

২. সে তো সেই যে, এতিমকে বৃঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়।

৩. এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না।

৪. সুতরাং দুর্ভেগ সেই সালাত আদায়করীদের।

৫. যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন।

৬. যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে।

৭. গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোটখাটো সাহায্যদানে বিরত থাকে।

সূরা কাওছার (سُورَةُ الْكَوْثَرِ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম দয়াময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

মাক্কি সূরা, আয়াত সংখ্যা- ৩

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحِرْ فَإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

বাংলা উচ্চারণ :

১. ইন্না আতাইনা কালকাওছার।
২. ফাসাল্লি লি রাবিকা ওয়ানহার।
৩. ইন্না শানিয়াকা তুয়াল আবতার।

অর্থ : ১. আমি অবশ্যই তোমাকে কাওছার দান করেছি।

২. সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানি কর।
৩. নিশ্চয়ই তোমার প্রতি বিদ্যে পোষণকারীই তো নির্বৎশ।

সূরা কাফিরুন (سُورَةُ الْكُفَّارُ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম দয়াময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

মাকি সূরা, আয়াত সংখ্যা- ৬

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكُفَّارُ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عِبْدُونَ مَا أَعْبُدُ

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عِبْدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِي

বাংলা উচ্চারণ:

১. কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন।
২. লা আবুদু মা তাবুদুন।
৩. ওয়ালা আনতুম আবিদুনা মা আবুদ।
৪. ওয়া লা আনা আবিদুম মা আবাততুম।
৫. ওয়া লা আনতুম আবিদুনা মা আবুদ।
৬. লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন।

অর্থ : ১. বল, হে কাফিরগণ!

২. আমি তার ইবাদত করি না, যার ইবাদত তোমরা কর।
৩. এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি।
৪. এবং আমি ইবাদতকারী নই তার, যার ইবাদত তোমরা করে আসছ।
৫. এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি।
৬. তোমাদের দীন তোমাদের, আর আমার দীন আমার জন্য।

অনুশীলনী

নৈর্বাচিক প্রশ্ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১) কঠনালির মাঝখান থেকে উচ্চারিত হয়-

ক. ঙ_ো

খ. গু_খ

গ. হু_ু

ঘ. ফ

২) কঠনালির শেষ অংশ থেকে উচ্চারিত হয়-

ক. হু_ু

খ. গু_খ

গ. জু_শু

ঘ. ঙ_ো

৩) জিহ্বার অগভাগ তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়-

ক. ল

খ. ফ

গ. ত

ঘ. প

৪) জিহ্বার অগভাগ সামনের উপরের দুই দাঁতের শেষভাগে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়-

ক. ط د ت

খ. س ز

গ. ঙ_ো

ঘ. ফ

৫) জিহ্বার গোড়া তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়-

ক. ঙ_ো

খ. ক

গ. খু_খ

ঘ. ক

৬) জিহ্বার মধ্যভাগ তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়-

ক. ج_ش_ی

খ. ر

গ. ط د ت

ঘ. ص س ز

৭) জিহ্বার অগ্রভাগ উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়-

ক. ث ذ ظ

খ. ث

গ. ص س ز

ঘ. ط د ت

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. কুরআন মজিদ আল্লাহর |

২. জিহ্বার গোড়া তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় |

৩. ح_ع কঠনালির থেকে উচ্চারিত হয়।

৪. বিরাম চিহ্নকে বলে।

৫. কুরআন মজিদের ভাষা..... |

গ. বাম পাশের শব্দগুলোর সাথে ডান পাশের শব্দগুলো মিল কর:

বাম পাশ

ডান পাশ

কুরআন মজিদ তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য আসমানি কিতাব

কুরআন মজিদ হলো সর্বশেষ ৪টি

দুই ঠোঁট থেকে উচ্চারিত হয় ق

জিহ্বার গোড়া তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় ۳ - ۶

কঠনালির শুরু থেকে উচ্চারিত হয় ر، ب

ঘ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. কুরআন মজিদ পাঠের উদ্দেশ্য কয়টি?
২. মাখরাজ কয়টি?
৩. কঢ়নালির হরফ কয়টি?
৪. ৩ ৬ ৯ কোথা থেকে উচ্চারিত হয়?
৫. দুই ঠোঁট থেকে কোন কোন হরফ উচ্চারিত হয়?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. কুরআন মজিদ কার বাণী? কুরআন মজিদ তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য কয়টি ও কী কী?
২. কুরআন মজিদ বুবো তিলাওয়াত করলে কী কী বিষয়ে জানতে পারবে তার একটি তালিকা তৈরি কর।
৩. তাজবিদ কাকে বলে? সঠিক উচ্চারণে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করার কী কী লাভ আছে উল্লেখ কর।
৪. মাখরাজ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।
৫. কোন কোন স্থান থেকে আরবি বর্ণগুলো উচ্চারিত হয় তার একটি তালিকা তৈরি কর।
৬. কঢ়নালি থেকে কোন কোন বর্ণ উচ্চারিত হয় তা লেখ।
৭. জিহ্বা থেকে যেসব বর্ণ উচ্চারিত হয় তার একটি তালিকা তৈরি কর।
৮. ওয়াক্ফ কাকে বলে? এর উদ্দেশ্য কী? সর্বপ্রথম কে এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করেন?
৯. ওয়াক্ফে তাম, লাজিম ও মুতলাকের চিহ্নগুলো অঙ্কন কর ও বিরতির সময়সীমা লেখ।
১০. সূরা ফীলের অর্থ লেখ।
১১. সূরা আল কাওছার আরবিতে লেখ।

পঞ্চম অধ্যায়

মহানবি (স)-এর জীবনাদর্শ ও অন্যান্য

নবিগণের পরিচয়

আমরা আগেই জেনেছি, আল্লাহ তায়ালা মানুষের হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা নিজেরা আল্লাহর হুকুম পালন করে মানুষদের হাতে-কলমে শিক্ষা দিতেন। তাঁরা ছিলেন মানুষের মহান ও আদর্শ শিক্ষক। নবি-রাসূলগণ ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁরা ছিলেন সত্যবাদী, নির্ণোভ ও নিষ্পাপ। তাঁরা ছিলেন দয়ালু ও মানব-দরদী। তাঁরা আজীবন মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। তাঁরা আল্লাহ তায়ালার দীন প্রচারে সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করেছেন। পৃথিবীতে অনেক নবি-রাসূল এসেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম নবি হ্যরত আদম (আ) আর সর্বশেষ নবি হ্যরত মুহাম্মদ (স)। এ অধ্যায়ে আমরা মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স) এর জীবনাদর্শ, কুরআন মজিদে উল্লিখিত ২৫ জন নবির নাম এবং করেকজন নবির পরিচয় জানবো।

মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স) এর জীবনাদর্শ

মহানবি (স)-এর জন্ম ও পরিচয়

মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স) ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল এবং রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার মকার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ, মাতার নাম আমিনা। তাঁর দাদার নাম ছিল আব্দুল মুত্তালিব। জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয় মুহাম্মদ এবং আহমাদ। তাঁর জন্মের পূর্বেই পিতা আব্দুল্লাহ মারা যান।

তৎকালীন আরবের অবস্থা

মহানবি (স)-এর জন্মের সময় আরবের লোকেরা নানা পাপের কাজে লিপ্ত ছিল। মারামারি, কাটাকাটি, বাগড়া-ফেসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুঞ্ছন, মদ, জুয়া ইত্যাদি নিয়েই তারা মেতে ছিল। এক আল্লাহকে ভুলে তারা নানা দেব-দেবীর মূর্তি বানিয়ে পূজা করত। পবিত্র কাবা তারা মূর্তিতে ভরে রেখে ছিল। কাবা প্রাঙ্গাণে তারা ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করেছিল। তখন বাজারে পণ্যের মতো মানুষ বেচাকেনা হতো।

মনিবরা দাস-দাসীদের প্রতি অমানবিক নির্যাতন করত। পরিবারে ও সমাজে নারীদের কোনো মান-সম্মান বা অধিকার ছিল না। সে সময় কন্যাশিশু জন্মগ্রহণ করা পিতা-মাতার জন্য খুবই অপমানের বিষয় ছিল। মেয়ে শিশুদের নিষ্ঠুরভাবে মাটিতে পুঁতে জীবন্ত হত্যা করা হতো। তাদের আচার-আচরণ ছিল বর্বর ও মানবতাবিরোধী। এ সময়ে মানুষের জানমালের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। মদপান, জুয়াখেলা, সুন্দ, ব্যভিচার ছিল তখনকার লোকদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। কুসংস্কার ও পাপ-পঞ্জিকার অতলতলে নিমজ্জিত ছিল তারা। সে সময়কে বলা হয় ‘আইয়ামে জাহিলিয়া’ বা মূর্খতার যুগ। মানবতার এ চরম দুর্দিনে আব্লাহ তায়ালা তাঁর বশ্য সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব হ্যরত মুহাম্মদ (স) কে পাঠাণেন বিশ্বমানবতার শান্তিদৃত হিসেবে। পথহারা মানুষকে সত্য, সুন্দর, ধর্ম ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করার জন্য।

শৈশব ও কৈশোর

হ্যরত মুহাম্মদ (স)-এর জন্মের পর চাচা আবু লাহাবের দাসী সোয়েবা তাঁকে মাতৃস্নেহে লালন-পালন করেন। তারপর তখনকার সন্ত্রাস কুরাইশ বংশের প্রথা অনুসারে বানু সাদ গোত্রের বেদুইন মহিলা হালিমার হাতে তাঁর লালনপালনের ভার দেওয়া হয়। সোয়েবা যদিও তাঁকে অল্পদিন লালন-পালন করেছেন, তবুও তিনি প্রথম দুধমাতা ও তাঁর পরিবারের প্রতি খুব কৃতজ্ঞ ছিলেন। অনেকদিন পরেও তাঁদের খোঁজ-খবর নিয়েছেন এবং উপহার উপটোকন দিয়েছেন। পাঁচ বছর পর্যন্ত বিবি হালিমা নিজের সন্তানের মতো শিশু মুহাম্মদ (স)কে লালনপালন করেন। এ সময় শিশু মুহাম্মদ (স)-এর চরিত্রে ইনসাফ ও ত্যাগের একটি অনুপম দ্রষ্টান্ত ফুটে ওঠে। তিনি হালিমার একটি স্তন থেকে দুধ পান করতেন, অন্যটি দুধ ভাই আবদুল্লাহর জন্য রেখে দিতেন। তিনি বেদুইন পরিবারে থেকে বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শিখেন ও মরুভূমির মুক্ত পরিবেশে সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হন।

পাঁচ বছর বয়সে তিনি মা আমিনার কোলে ফিরে আসেন। আদর-সোহাগে মা তাঁকে লালনপালন করতে থাকেন। কিন্তু মায়ের আদর তাঁর কপালে বেশি দিন স্থায়ী হলো না। তাঁর ছয় বছর বয়সে মাও ইন্তিকাল করেন। এবার তিনি পিতা-মাতা দুজনকেই হারিয়ে এতিম হয়ে যান। এরপর তিনি দাদা আব্দুল মুভালিবের আদর-স্নেহে লালিত-পালিত হতে থাকেন। কিন্তু আট বছর বয়সের সময় তাঁর দাদাও মারা যান। এরপর তিনি চাচা আবু তালিবের আশ্রয়ে বড় হতে থাকেন।

আবু তালিবের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিলো না। কিশোর মুহাম্মদ (স) ছিলেন কর্মঠ। কারও গলগ্রহ হয়ে থাকা তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি চাচার অসচ্ছল পরিবারে নানাভাবে সাহায্য করতেন। বাড়তি আয়ের জন্য রাখালদের সাথে ছাগল-মেষ চরাতেন। রাখাল বালকদের জন্য তিনি ছিলেন আদর্শ। তাদের সাথে তিনি সৌহার্দ্য সম্প্রীতি বজায় রাখতেন। রাখালদের মধ্যে ঝাগড়া-বিবাদ হলে তিনি বিচারকের ভূমিকা পালন করতেন। তিনি চাচার ব্যবসা-বাণিজ্যও সাহায্য করতেন। একবার চাচার সাথে ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়াও গিয়েছিলেন। এ সময় বহিরা নামক এক পাত্রির সাথে তাঁর দেখা হয়। বহিরা তাঁকে অসাধারণ বালক বলে মন্তব্য করেন এবং শেষ নবি বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তিনি আবু তালিবকে তাঁর ব্যাপারে সাবধানও করেন। কারণ শত্রুরা তাঁর অনিষ্ট করতে পারে।

সিরিয়া থেকে ফেরার পর বালক মুহাম্মদ (স) ফিজার যুদ্ধের বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করে আঁতকে ওঠেন। ওকায মেলায় জুয়া খেলাকে কেন্দ্র করে এ যুদ্ধ হয়েছিল। কায়স গোত্র অন্যায়ভাবে এ যুদ্ধ কুরাইশদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল। এজন্য একে ‘হারবুল ফিজার’ বা অন্যায় সমর বলা হয়। এ যুদ্ধ চলে একটানা পাঁচ বছর। অনেক মানুষ আহত-নিহত হলো। যুদ্ধের বিভীষিকাময় করুণ দৃশ্য দেখে, আহতদের করুণ আর্তনাদে তাঁর কোমল হৃদয় কেঁদে উঠল। তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন।

তিনি শান্তিকামী উৎসাহী যুবক বন্ধুদের নিয়ে ‘হিলফুল ফুয়ুল’ নামে একটি শান্তি সংঘ গঠন করলেন। এ সংঘের উদ্দেশ্য ছিল আর্তের সেবা করা, অত্যাচারীকে প্রতিরোধ করা, অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, শান্তি - শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং গোত্রে গোত্রে সম্প্রীতি বজায় রাখা ইত্যাদি। তিনি তাঁর প্রচেষ্টায় অনেক সফলতা লাভ করেন। সেদিনকার শান্তি সংঘের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আজও আমাদের কিশোর ও যুব সমাজ নিজেদের এ ধরনের মহৎ কাজে নিয়োজিত করতে পারে।

ইতোমধ্যেই সত্যবাদী, বিশ্বাসী, আমানতদার, বিচক্ষণ, পরোপকারী, শান্তিকামী যুবক হিসেবে হ্যরত মুহাম্মদ (স)-এর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আপন-পর সকলেই তাঁকে ‘আস সাদিক’ মানে সত্যবাদী, ‘আল-আমীন’ মানে বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত করল। তাঁর কাছে ধন-সম্পদ আমানত রাখতে লাগল।

হাজরে আসওয়াদ স্থাপন

বহুদিন পূর্বের নির্মিত পুরাতন কাবাঘর সংস্কারের কাজ হাতে নিল কুরাইশরা। যথারীতি কাবাঘর সংস্কার করল তারা। কিন্তু পরিত্র হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর স্থাপন

নিয়ে বিবাদ লেগে গেল। প্রত্যেক গোত্রই এ পাথর কাবাঘরের দেয়ালে স্থাপনের সম্মান নিতে চাইল। যুদ্ধের সাজ সাজ রব পড়ে গেল। অবশেষে প্রবীণতম গোত্র প্রধান উমাইয়া বিন মুগীরার প্রস্তাব অনুসারে সিদ্ধান্ত হলো, পরদিন প্রত্যুষে যে ব্যক্তি সবার আগে কাবাঘরে আসবেন তাঁর ওপরই বিবাদ মীমাংসার ভার অর্পিত হবে। তাঁর সিদ্ধান্ত সবাই মেনে নিবে। প্রত্যুষে দেখা গেল – হ্যরত মুহাম্মদ (স) কাবাঘরে প্রবেশ করছেন। সবাই আনন্দে চিৎকার করে বলল – ‘আল-আমীন’ আসছেন, আমরা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। সঠিক মীমাংসাই হবে। মুহাম্মদ (স) একখানা চাদর বিছিয়ে দিলেন। তারপর চাদরে নিজ হাতে পাথরখানা রাখলেন। গোত্র সরদারগণকে ডেকে চাদর ধরতে বললেন। তারা ধরে তা যথাস্থানে বহন করে নিয়ে গেল। ‘আল-আমীন’ নিজের হাতে পাথরখানা কাবাঘরের দেয়ালে বাসিয়ে দিলেন। একটি অনিবার্য যুদ্ধ থেকে সবাই বেঁচে গেল। পাথর উঠাবার সম্মান পেয়ে সবাই খুশি হলো। বিচার ফয়সালায় বিচক্ষণতা ও নিরপেক্ষতা অবলম্বন করলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক অনিবার্য সংঘাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

হ্যরত খাদিজার ব্যবসায়ের দায়িত্ব গ্রহণ ও বিবাহ

তখনকার দিনে আরবে একজন বিখ্যাত ধনী ও বিদুরী মহিলা ছিলেন। তাঁর নাম খাদিজা। তিনি তাঁর বিশাল বাণিজ্য দেখাশোনা করার জন্য একজন বিশ্বাসী বিচক্ষণ লোক খুঁজছিলেন। হ্যরত মুহাম্মদ (স)-এর সুন্দর চরিত্রের সুনাম শুনে তিনি তাঁর ওপর ব্যবসায়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন। মুহাম্মদ (স) খাদিজার ব্যবসায়ের দায়িত্ব নিয়ে সিরিয়া যান। সাথে খাদিজার বিশ্বস্ত কর্মচারী মাইসারাও ছিলেন। ব্যবসায়ে আশাতীত লাভ করে তিনি মুক্ত ফিরে আসেন। মাইসারার কাছে হ্যরত মুহাম্মদ (স)-এর সততা, বিচক্ষণতা ও কর্মদক্ষতার কথা শুনে খাদিজা অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তিনি তাঁর সাথে নিজের বিয়ের প্রস্তাব দেন। মুহাম্মদ (স)-এর চাচা আবু তালিব হ্যরত মুহাম্মদ (স)-এর সাথে খাদিজার বিয়ের সকল ব্যবস্থা করে দেন। শুভ বিবাহ সম্পন্ন হলো, তখন মুহাম্মদ (স)-এর বয়স পঁচিশ বছর। আর খাদিজার বয়স চল্লিশ বছর। তাঁদের দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত সুখের হয়েছিল। হ্যরত খাদিজা বেঁচে থাকতে তিনি অন্য কোনো বিয়ে করেননি। বিয়ের পরে খাদিজার আন্তরিকতায় তিনি প্রচুর সম্পদের মালিক হন। কিন্তু তিনি এ সম্পদ ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশে ব্যয় না করে গরিব-দুঃখী ও আর্ত-পীড়িতদের জন্য অকাতরে ব্যয় করেন।

নবুয়ত লাভ

হ্যরত মুহাম্মদ (স) শিশু বয়স থেকেই মানুষের মুক্তির জন্য, শান্তির জন্য ভাবতেন। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁর এ ভাবনা আরও গভীর হয়। মূর্তি পূজা ও কুসংস্কারে লিপ্ত এবং নানা দুঃখকষ্টে জর্জরিত মানুষের মুক্তির জন্য তাঁর সব ভাবনা। মানুষ তাঁর স্মর্ফটাকে ভুলে যাবে, হাতে বানানো মূর্তির সামনে মাথা নত করবে, এটা হয় না। কী করা যায়, কীভাবে মানুষের হৃদয়ে এক আল্লাহর ভাবনা জাগানো যায়। কী করে কুফর শিরক থেকে তাদের মুক্ত করা যায়। এ সকল বিষয়ের চিন্তা-ভাবনায় তিনি মগ্ন। বাড়ি থেকে তিনি মাইল দূরে নির্জন হেরো পর্বতের গুহায় নির্জনে ধ্যান করতেন। কখনো কখনো একাধারে দুই-তিনি দিনও সেখানে ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। এভাবে দীর্ঘদিন ধ্যানমগ্ন থাকার পর অবশেষে চাঞ্চিল বছর বয়সে রম্যান মাসের কদরের রাতে আঁধার গুহা আলোকিত হয়ে উঠল।



হেরো গুহা

আল্লাহর ফেরেশতা জিবরাস্তল (আ) আল্লাহর মহান বাণী ওহি নিয়ে আসলেন। মহানবি (স) কে লক্ষ্য করে বললেন—‘ইকরা’ (পড়ুন)। তিনি মহানবি (স) কে সূরা আলাক-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন—

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلْقٍ .

إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمِ . عَلِمَ الْإِنْسَانَ

مَا لَمْ يَعْلَمْ .

বাংলা উচ্চারণ :

ইকরা বিসমি রাবিকাল্লায়ি খালাক। খালাকাল ইনসানা মিন আলাক। ইকরা ওয়া রাবুকাল আকরাম। আল্লায়ি আল্লামা বিল কালাম। আল্লামাল ইনসানা মা-লাম ইয়ালাম।

- অর্থ : ১. পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।
 ২. যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক (ঠেঁটে থাকা বস্তু) থেকে।
 ৩. পাঠ করুন, আপনার প্রতিপালক তো মহিমাপ্রিত।
 ৪. যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে।
 ৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে— যা সে জানত না। (সূরা আলাক, আয়াত: ১-৫)

নবিজি ঘরে ফিরে খাদিজার কাছে সব ঘটনা প্রকাশ করলেন এবং বললেন, “আমাকে বদ্ধাবৃত করো, আমি আমার জীবনের আশঙ্কা করছি।” তখন খাদিজা নবিজিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, “না, কখনও না। আল্লাহর কসম! তিনি কখনও আপনার অনিষ্ট করবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়- স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করেন, আর্ত-পীড়িত ও দুস্থদের সাহায্য করেন, মেহমানদের সেবা-যত্ন করেন এবং প্রাকৃতিক দুর্ঘোগে সাহায্য করেন।” হ্যরত খাদিজার এই উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবুয়ত লাভের আগেও মহানবি (স) নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে মানবিক মহৎ গুণাবলির অনুশীলন করতেন, মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। বর্বর আরবদের মধ্যে থেকেও তিনি নির্মল ও সুন্দর জীবনযাপন করতেন। তিনি ছিলেন সমগ্র মানবজাতির জন্য আদর্শ।

ইমানের দাওয়াত

নবুয়ত লাভের পর হ্যরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর নির্দেশে প্রথমে নিকট আত্মীয়- স্বজনের কাছে গোপনে ইমানের দাওয়াত দিতে থাকেন। তাঁর দাওয়াতে সর্ব প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁর সুখ-দুঃখের অংশীদার সতী-সাধ্বী স্ত্রী হ্যরত খাদিজা (রা)। এরপর তাঁদের

পরিবারভুক্ত হ্যরত আলী (রা) ও হ্যরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। পরিবারের বাইরে এবং বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন হ্যরত আবুবকর (রা)। তিনি ছিলেন রাসুল (স)-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এরপর আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ পেয়ে তিনি প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। এতে মৃত্তি পূজারিবা তাঁর ঘোর বিরোধিতা শুরু করে। মহানবি(স) ও তাঁর সাহাবিদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাতে থাকে। তারা মহানবি (স) কে নানা রকম প্রগৱে দেখাতে থাকে। নেতৃত্ব ও ধন-সম্পদ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। রাসুল (স) স্পষ্টভাবে তাদেরকে জানিয়ে দেন, “আমার এক হাতে সূর্য, আর এক হাতে চন্দ্র এনে দিলেও আমি এ সত্য প্রচার থেকে বিরত হব না।”

তিনি বললেন, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাঝুদ নেই। ইবাদত করতে হবে একমাত্র তাঁরই। তিনি এক, অদ্বিতীয়। তার কোনো শরিক নেই। তিনি আরও বললেন, তোমাদের হাতে বানানো দেবদেবীর ও প্রতিমার কোনো ক্ষমতা নেই। এদের ভালোমন্দ করার কোনো শক্তি নেই। আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনিই সবকিছুর স্বষ্টা, পালনকারী ও রিজিকদাতা। তিনিই আমাদের জীবন-মৃত্যুর মালিক। সুতরাং দাসত্ব, আনুগত্য ও ইবাদত করতে হবে একমাত্র তারই।

তিনি আরও বললেন, তোমরা সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের পথে ফিরে এসো। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, জুয়া, ব্যতিচার, মিথ্যা, প্রতারণা এসবই পাপের কাজ। সুতরাং এগুলো পরিহার করো। কারো প্রতি অন্যায়-অবিচার করবে না। অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করবে না। অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ হরণ করবে না। কারো প্রতি জুলুম করবে না।

মহানবি (স) আরও বোঝালেন, তোমাদের দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়। মৃত্যুর পরে আরও এক জীবন আছে, তাকে বলে পরকাল। সে জীবন অনন্তকালের। পরকালে আল্লাহর দরবারে দুনিয়ার ভালোমন্দ সব কাজের জন্য হিসাব দিতে হবে।

দুনিয়ার জীবনে যারা আল্লাহ ও রাসুলের কথা মানবে, ভালো কাজ করবে, পরকালে তারা মৃত্তি পাবে। চিরসুখের স্থান জান্নাত লাভ করবে। আর যারা আল্লাহ ও রাসুলের কথা মানবে না, মন্দ কাজ করবে, তারা চরম শাস্তির স্থান জাহানামে নিষ্পিণ্ঠ হবে।

ইসলাম প্রচারে তায়েফ গমন

নবুয়তের দশম বছরে মহানবি (স)-এর প্রিয়তমা সহধর্মিনী হ্যরত খাদিজা (রা) ও তাঁর স্নেহপরায়ণ চাচা আবু তালিব ইস্তিকাল করেন। এতে তিনি শোকে মুহ্যমান হয়ে

পড়েন। সীমাহীন শোক ও কাফেরদের অকথ্য অত্যাচারের মুখেও তিনি দীন প্রচার করতে থাকেন। তিনি মকাবাসীদের থেকে এক রকম নিরাশ হয়েই দীন প্রচারের জন্য তায়েফ গমন করেন। সেখানকার লোকেরা ইসলাম গ্রহণতো করলাই না, বরং তারা প্রস্তরাঘাতে মহানবি (স)-এর পবিত্র শরীর ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তান্ত করে ছাড়ল। মহানবি (স) এমন সময়ও তায়েফবাসীদের জন্য বদদোয়া করলেন না। বরং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন। ইতিহাসে এমন ক্ষমার দৃষ্টান্ত বিরল।

মিরাজে গমন

মকার কাফেরদের সীমাহীন অত্যাচার ও তায়েফবাসীর দুর্ব্যবহারে মহানবি (স) অত্যন্ত মর্মাহত ও ব্যথিত হলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নিজের সান্নিধ্যে নিয়ে গেলেন। তিনি মিরাজে গমন করলেন। তিনি আল্লাহ পাকের দিদারে ধন্য হলেন। নবুয়তের একাদশ সনে রজব মাসের ২৭ তারিখে আল্লাহ তায়ালা মহানবি (স)-কে মসজিদে হারাম থেকে বাযতুল মুকাদ্দাস এবং সেখান থেকে উর্ধ্বলোকে ভ্রমণ করিয়ে আনেন। একেই বলে মিরাজ।



বাযতুল মুকাদ্দাস

এই ভ্রমণে বাযতুল মুকাদ্দাসে তিনি পূর্ববর্তী নবিগণের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাঁদের ইমাম হয়ে সালাত আদায় করেন। সেখান থেকে সাত আসমান অতিক্রম করে আল্লাহ তায়ালার দিদার লাভ করেন। তিনি আল্লাহর নিকট থেকে পাঁচ ওয়াক্ত সাগাতের নির্দেশ

পান। মিরাজ মহানবি (স)-এর জীবনে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এতে তিনি নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে পূর্ণ উদ্যমে দীন প্রচার করতে থাকেন। এই সফরে জান্মাত-জাহান্মাম দর্শন করে অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

মদিনায় হিজরত

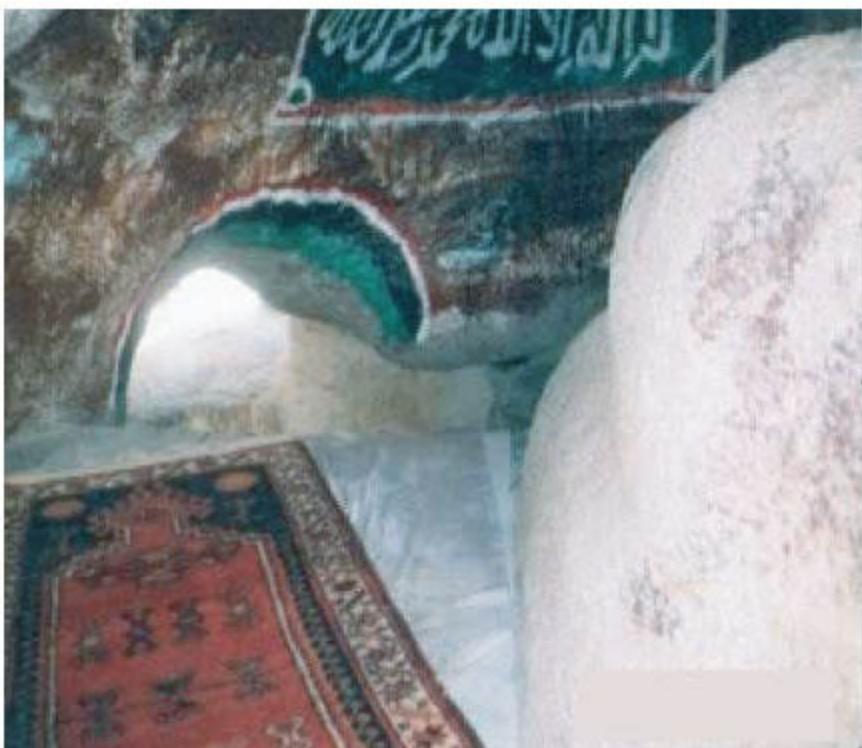
৬২১ খ্রিস্টাব্দে হজের মৌসুমে মদিনা থেকে ১২ জন লোকের একটি দল মক্কায় আসেন এবং গোপনে মহানবি (স)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তী বছর ঐ সময় মদিনা থেকে ২ জন মহিলাসহ ৭৫ জনের একটি দল মক্কায় আসেন এবং আকাবায় মহানবি (স)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা মহানবি (স) ও সাহাবিদের মদিনায় হিজরতের আহ্বান জানান এবং সব রকম সাহায্য সহযোগিতা দেওয়ার অঙ্গীকার করেন।

মক্কার কাফিরদের বিরোধিতা ও নির্যাতনের মাত্রা যখন বেড়ে গেল এবং মক্কায় ইসলাম প্রচার বীধাত্রী হলো, তখন মহানবি (স) সাহাবিগণকে মদিনায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন এবং নিজে আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় রাইলেন।

আল্লাহর ওপর মহানবি (স)-এর গভীর আশ্চর্য ও অটল বিশ্বাস

কাফেররা দেখল যে, মুসলমানরা মক্কা ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে যাচ্ছে। নবি করিম (স) হয়তো এক ফাঁকে দেশ ছেড়ে চলে যাবেন, তাদের শিকার হাত ছাড়া হয়ে যাবে। সকল গোত্র সম্মিলিতভাবে মহানবি (স)-কে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল। এক রাতে তারা নবি করিম (স) – এর ঘর ঘিরে রাখল এবং প্রত্যয়ে তাঁকে হত্যা করার অপেক্ষায় থাকল। আল্লাহ তায়ালা নবিকে কাফেরদের চৰ্কাত্তের কথা জানিয়ে দিলেন এবং মদিনায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন। হিজরত অর্থ ‘দেশত্যাগ’। মহানবি (স) হ্যরত আবু বকর (রা) কে সঙ্গে নিয়ে মদিনায় রওয়ানা হলেন। গচ্ছিত সম্পদ মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মহানবি (স) হ্যরত আলী (রা) কে তাঁর ঘরে রেখে যান। কাফেররা ঘরে চুক্তে নবি করিম (স)-কে না পেয়ে এবং তাঁর বিছানায় আলীকে দেখতে পেয়ে ক্রোধে অধীর হলো। কিন্তু নবি করিম (স)-এর আমানতদারি দেখে তারা মনে মনে লজ্জিত হলো। মহানবি (স) ও আবু বকর সিদ্দীক (রা) কিছুদুর অঃসর হয়ে মক্কার সাওর পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলেন। কাফেররা তাঁদের খুঁজতে খুঁজতে একেবারে গুহার মুখে হাজির হলো। আবু বকর (রা) গুহার মুখে কাফেরদের গতিবিধি লক্ষ্য করে বিচলিত হলেন। মহানবি (স) বললেন, “আবু বকর! চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।”

তিনদিন গুহায় অবস্থানের পর মহানবি (স) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর মদিনায় পৌছান। মদিনার আবাল বৃন্দ বনিতা পরম আগ্রহ ও ভালোবাসায় মহানবি (স)-কে গ্রহণ করলেন, মদিনার ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। নবিজি-এর হিজরত ইসলামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর মাধ্যমে ইসলাম নতুন গতি ও নতুন শক্তি লাভ করে।



সাওর গুহা

মহানবি (স) মুহাজির ও আনসারদের ভাতৃত্ব বৃন্দনে আবদ্ধ করেন। মুহাজির মানে-হিজরতকারী। মুক্ত থেকে হিজরত করে যাঁরা মদিনায় যান তাঁদেরকে বলা হয় মুহাজির। আর মুহাজিরদের মদিনায় যাঁরা আশ্রয় ও সাহায্য সহযোগিতা দিলেন, তাঁরা হলেন আনসার। আনসার মানে-সাহায্যকারী।

মদিনা সনদ

মহানবি (স) মদিনায় হিজরত করে একটি আদর্শ সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলেন। এখানে মুহাজির, আনসারসহ সকল মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী-ইহুদি,

খ্রিস্টান ও অন্যান্য মতাদর্শের লোক একত্রে মিলেমিশে সুখে-শান্তিতে নিরাপদে বাস করবে। তাদের মধ্যে শান্তি, সম্প্রীতি বজায় থাকবে এবং স্বাধীনতাবে নিজ নিজ ধর্মকর্ম পালন করতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে মদিনার নিরাপত্তাও নিশ্চিত হবে এই উদ্দেশ্যে, তিনি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি লিখিত চুক্তি সম্পাদন করেন। এটিই মদিনা সনদ নামে খ্যাত এবং এটিই পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত সনদ। এই সনদে ৪৭টি ধারা ছিল। যেমন-

১. সকল সম্প্রদায় স্বাধীনতাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। ধর্মীয় ব্যাপারে কেউ কারও ওপর হস্তক্ষেপ করবে না।
২. সনদে স্বাক্ষরকারী সকল সম্প্রদায়কে নিয়ে একটি সাধারণ জাতি গঠিত হবে এবং সকলে সমান নাগরিক সুবিধা তোগ করবে।
৩. কেউ অপরাধ করলে তা তার ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে; সে জন্য গোত্র বা সম্প্রদায় দায়ী হবে না।
৪. হত্যা, রক্তারক্তি, ব্যভিচার ইত্যাদি পাপকর্ম নিয়ন্ত্র করা হলো, মদিনা শহরকে পরিত্র বলে ঘোষণা করা হলো।
৫. হ্যরত মুহাম্মদ (স)-এর পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কেউ কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।
৬. সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে মহানবি (স) তা মীমাংসা করে দিবেন ইত্যাদি।

মদিনার সনদ হ্যরত মুহাম্মদ (স)-এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, কূটনৈতিক দূরদর্শিতা, ধর্মীয় সহিত্যতা এবং সুন্দর সমাজ গঠনের এক জুলত স্বাক্ষর বহন করে। এতে বিভিন্ন জাতির ধর্মীয় স্বাধীনতা ও আর্থ-সামাজিক অধিকার নিশ্চিত হয়।

বদর ও অন্যান্য যুদ্ধ

মক্কার কাফির-মুশরিকরা চেয়েছিল ইসলাম ও মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে। মদিনায় ইসলামের উত্তরোন্তর উন্নতি দেখে তারা হিংসায় জ্বলে ওঠে। মদিনার ইহুদিরা তাদের প্ররোচিত করছিল। আবার আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার গুজব উঠেছিল।

কাফেররা মদিনা আক্রমণের জন্য রওয়ানা হলো। সংবাদ পেয়ে রাসুল (স) ৩১৩ জন সাহাবিসহ মদিনা থেকে প্রায় ৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বদর নামক স্থানে উপস্থিত হন। দ্বিতীয় হিজরির ১৭ রম্যান (৬২৪ খ্রিস্টাব্দ) বদর প্রান্তরে দুই পক্ষ পরস্পর মুখোমুখী হলো। কুরাইশ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা এক হাজার। তাদের অন্তর্শন্ত্রে বেশুমার। মুসলিমদের সংখ্যা নগণ্য। অন্তর্শন্ত্র তেমন কিছু নেই। কিন্তু তাঁরা ইমানের বলে বলীয়ান। তাঁদের আল্লাহর উপর অকৃত্রিম বিশ্বাস ও ভরসা। তুমুল যুদ্ধ হলো। মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হলো।



ওহুদ পাহাড়

বদর যুদ্ধে কুরাইশ নেতা আবু জাহেল, ওলীদ, উৎবা ও শায়বাসহ ৭০ জন মারা যায় এবং ৭০ জন বন্দি হয়। মুসলিম পক্ষে ১৪ জন শহিদ হন কিন্তু কেউ বন্দি হননি। রাসুল (স) ও মুসলিমগণ যুদ্ধ বন্দিদের সাথে উদার ও মানবিক আচরণ করেছিলেন। নিজেরা না থেরে বন্দিদের খাওয়াতেন। নিজেরা পায়ে হেঁটে বন্দিদের বাহনের ব্যবস্থা করতেন। বন্দি মুক্তির চমৎকার ব্যবস্থা করেছিলেন। শিক্ষিত বন্দিদের মুক্তিপণ নির্ধারণ করা হয়েছিল ১০ জন করে নিরক্ষর মুসলিম বালক-বালিকাদের শিক্ষিত করা। এটি শিক্ষাবিষ্টারে রসুল (স)-এর প্রচেষ্টারই অংশ। এ যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। স্বল্পসংখ্যক মুসলিম বাহিনীর হাতে কাফেরদের বিরাট বাহিনী পরাজিত হয়। এতে কাফেরদের মনে ভীতির সংঘার হয়।

বদর যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পরেও কাফেররা দমে গেল না। তারা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে বারবার আক্রমণ চালাতে লাগল। এরমধ্যে ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ ছিল ভয়াবহ। এসব যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় হলেও ওহুদ যুদ্ধে সামান্য ভুলের জন্য মুসলমানদের অনেক ক্ষতি হয়েছিল। ৭০ জন সাহাবা শাহাদত বরণ করেন। মহানবি (স)-এর পবিত্র দাঁত ভেঙে যায়।

হুদাইবিয়ার সন্ধি

হিজরী ৬ সনে (৬২৮ খ্রিস্টাব্দে) রাসূল (স) উমরা, পালনের উদ্দেশ্যে ১৪০০ জন সাহাবিসহ মক্কা যাত্রা করেন এবং মক্কার ৯ মাইল দূরে হুদাইবিয়া নামক স্থানে উপনীত হন। কুরাইশরা উমরাহ পালনে বাধা দেয়। রাসূল (স) জানালেন, “আমরা যুদ্ধের জন্য আসিনি, শুধু উমরাহ করেই চলে যাব।” কিন্তু কুরাইশরা তাতেও রাজি হলো না। রাসূল (স) মকাবাসীদের কাছে উসমান (রা) কে দৃত হিসেবে পাঠান। তাঁর ফিরে আসতে বিলম্ব হওয়ায় তিনি শহিদ হয়েছেন বলে রব ওঠে। রাসূল (স) মুসলমানদের থেকে এই হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার শপথ নেন। কাফেররা ভীত হয়ে উসমান (রা)-কে ফেরত দেয় এবং সুহাইল আমরকে সন্ধির প্রস্তাবসহ পাঠায়। দশ বছরের জন্য সন্ধি হয়। এটিই হুদাইবিয়ার সন্ধি নামে খ্যাত।

সন্ধির শর্তগুলোর মধ্যে অন্যতম শর্ত ছিল:

১. মুসলমানগণ এ বছর উমরা না করেই ফিরে যাবেন, আগামী বছর নিরন্তরভাবে তিন দিনের জন্য আসবেন,
২. কোনো মকাবাসী মদিনায় আশ্রয় নিলে তাকে মকায় ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন, কিন্তু কেউ মদিনা থেকে মকায় আসলে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না। আরবের যে কোনো গোত্র দুপক্ষের যে কারো সাথে মিত্রতা করতে পারবে ইত্যাদি।

আপাতদৃষ্টিতে এই সন্ধির শর্তগুলো মুসলমানদের জন্য অপমানজনক মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে সুফল বরে এনেছিল। এতে কাফেররা মুসলমানদের একটি শক্তিধর স্বত্ত্ব জাতি হিসেবে মেনে নেয়। দেশ-বিদেশে ইসলাম প্রচারের সুযোগ হয়। দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। একে কুরআনে ‘প্রকাশ্য বিজয়’ বলা হয়েছে।

মক্কা বিজয়

কুরাইশ ও তাদের মিত্র বনু বকর হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে মুসলমানদের মিত্র খুয়আ গোত্রকে আক্রমণ করে, তাদের মালামাল লুট করে এবং অনেককে আহত ও নিহত করে। রাসূল (স)-এর শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ না করে তারা সন্ধি বাতিল করে।

৮ম হিজরির রমজান মাসে মহানবি (স) দশ হাজার সাহাবি নিয়ে মক্কা বিজয়ের জন্য যাত্রা করেন। হঠাৎ এতো বড় মুসলিম বাহিনী দেখে কুরাইশরা ভয় পেয়ে গেল। অবস্থা বেগতিক দেখে কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান মহানবি (স)-কে মক্কায় স্বাগত জানায়। মহানবি (স) প্রায় বিনা বাধায় একেবারে বিনা রক্তপাতে মক্কা জয় করেন।

ক্ষমা

যে মক্কাবাসী একদিন মহানবি (স) ও মুসলমানদের নির্মম নির্যাতন করেছিল, মহানবি (স) কে হত্যা করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল, যাকে জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল, মদিনায়ও তাকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। সেই মক্কায় তিনি বিজয়ীর বেশে হাজির হন। তিনি এখন মক্কার একচ্ছত্র অধিপতি। আর মক্কাবাসী তাঁর সামনে অপরাধীর বেশে দণ্ডায়মান।

মহানবি (স) জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা আমার কাছে কেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করছ?”

তারা বলল, “আজ আপনি আমাদের যে কোনো শান্তি দিতে পারেন, তবে আপনি তো আমাদের দয়ালু ভাই ও দয়ালু ভাইয়ের পুত্র, আপনার কাছে আমরা দয়াপূর্ণ ব্যবহারই প্রত্যাশা করছি।”

রাসূল (স) বললেন, “আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই, যাও তোমরা মুক্ত, স্বাধীন।”

মহানবি (স) সবাইকে ক্ষমা করেছিলেন। কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানকেও ক্ষমা করেছিলেন। এই আবু সুফিয়ান উহুদ যুদ্ধে কাফেরদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এতে মহানবি (স)-এর দাঁত শহিদ হয়েছিল। তাঁর প্রিয় চাচা হ্যরত হাময়া (রা) শহিদ

হয়েছিলেন। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা প্রতিহিংসার বশবতী হয়ে তাঁর কলিজা চর্বন করেছিল। তিনি তাকেও ক্ষমা করেছিলেন। ক্ষমার এ এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

বিদায় হজ

মহানবি (স) দশম হিজরিতে হজ পালনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এটা ছিল তাঁর জীবনের শেষ হজ। তিনি এরপর আর হজ করার সুযোগ পাননি। তাই একে বিদায় হজ বলে।

মহানবি (স) লক্ষাধিক সাহাবি নিয়ে হজ আদায় করেন। এই হজেই তিনি আরাফাত ময়দানে জাবালে রহমতে দাঁড়িয়ে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে এক মর্মসশী ভাষণ দেন। এটিই ইসলামের ইতিহাসে বিদায় হজের ভাষণ নামে খ্যাত।

এই ভাষণে মহানবি (স) সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন। যেমন—

১. সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই।
২. আজকের এদিন, এস্থান, এমাস যেমন পবিত্র, তেমনি তোমাদের পরস্পরের জ্ঞানমাল ও ইজ্জত-আবরু পরস্পরের নিকট পবিত্র।
৩. অধীনস্থদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তোমরা যা খাবে, তাদেরও তা খাওয়াবে। তোমরা যা পরবে তাদেরও তাই পরাবে।
৪. একের অপরাধে অন্যকে শান্তি দেবে না।
৫. ঋণ পরিশোধ করতে হবে। সর্বপ্রকার সুদ হারাম করা হলো। সকল সুদের পাওনা বাতিল করা হলো।
৬. নারীর ওপর পুরুষের যেমন অধিকার আছে, পুরুষের ওপর নারীরও তেমন অধিকার আছে।
৭. জাহেলি যুগের সকল কুসংস্কার ও হত্যার প্রতিশোধ বাতিল করা হলো।

৮. আমানতের খিয়ানত করবে না, গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকবে। মনে রাখবে একদিন সকলকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে এবং তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

৯. আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী (আল কুরআন) এবং তাঁর রাসূলের আদর্শ (হাদিস) রেখে যাচ্ছি, তোমরা এই দুইটি যতদিন আকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা বিপর্যাপ্ত হবে না।

তিনি আরও অনেক মূল্যবান কথা বললেন।

এরপর মহানবি (স) আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, “হে আল্লাহ! তোমার বাণীকে আমি যথাযথভাবে মানুষের নিকট পৌছাতে পেরেছি?”

উপস্থিত লক্ষ জনতা সমস্বরে জবাব দিলেন, “হ্যা, নিশ্চয়ই।”

মহানবি (স) বললেন, “হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।”

এরপর অবতীর্ণ হলো, “আমি আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। ইসলামকে তোমাদের জন্য একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।” (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৩)

বিদায় হজ থেকে ফেরার পর মহানবি (স) অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবশেষে হিজরি একাদশ সালের ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল (স) ইন্তিকাল করেন।

মদিনা শরিফে মসজিদে নববির এক পাশে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। বিশ্বের মুসলমানগণ ভক্তিভরে নববির রওজা জিয়ারত করেন।

মহানবি (স) ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের মানুষ। ক্ষমা, উদারতা, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, সততা, সত্যবাদিতা, দয়া, দানে, কাজে-কর্মে, আচার-আচরণে, মানবতা ও মহত্বে তিনি ছিলেন সর্বকালের সকল মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُشْوَةٌ حَسَنَةٌ

বাংলা উচ্চারণ: লাক্ষ্মুন কানা লাকুম ফী রাসুলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাতুন। অর্থ ‘অবশ্যই রাসুলুল্লাহ (স)-এর জীবনে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে।’ (সূরা আহ্যাব, আয়াত: ২১)

আমরা মহানবি (স)-এর জীবনাদর্শ মেনে চলব।

কুরআন মজিদে উল্লিখিত নবি-রাসূলগণের নাম:

১	হ্যরত আদম (আ)	১৪	হ্যরত সুলাইমান (আ)
২	হ্যরত নূহ (আ)	১৫	হ্যরত মূসা (আ)
৩	হ্যরত সালিহ (আ)	১৬	হ্যরত হারূন (আ)
৪	হ্যরত লৃত (আ)	১৭	হ্যরত ইলিয়াস (আ)
৫	হ্যরত ইদরীস (আ)	১৮	হ্যরত আইয়ুব (আ)
৬	হ্যরত হৃদ (আ)	১৯	হ্যরত ইউনুস (আ)
৭	হ্যরত ইবরাহীম (আ)	২০	হ্যরত জাকারিয়া (আ)
৮	হ্যরত ইসমাঈল (আ)	২১	হ্যরত ইয়াহিয়া (আ)
৯	হ্যরত ইসহাক (আ)	২২	হ্যরত যুলকিফল (আ)
১০	হ্যরত ইয়াকুব (আ)	২৩	হ্যরত আলা ইয়াসাআ (আ)
১১	হ্যরত ইউসুফ (আ)	২৪	হ্যরত দ্বিসা (আ)
১২	হ্যরত শুআইব (আ)	২৫	হ্যরত মুহাম্মদ (স)
১৩	হ্যরত দাউদ (আ)		

পরিকল্পিত কাজ :

১ কুরআন মজিদে উল্লিখিত নবি-রাসূলের নামের তালিকা তৈরি করবে।

২ মহানবি (স)-এর একটি সংক্ষিপ্ত জীবন বিবরণী তৈরি করবে।

হ্যরত আদম (আ)

আল্লাহ তায়ালা মাটি দিয়ে মানবদেহ তৈরি করলেন। তাতে আত্মা দিলেন। এরপর এই দেহ প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। ইনিই হলেন পৃথিবীর আদি মানব হ্যরত আদম (আ)।

আল্লাহ ফেরেশতাদের আদেশ দিলেন, “আদম তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তোমরা তাঁকে সম্মান জানাও। তাঁর সম্মানে তাঁকে সিজদাহ কর।” সবাই তাঁকে সম্মান দেখাল। তাঁকে

সিজদাহ্ করল। তবে এই ফেরেশতাদের সাথে ছিল এক জিন। নাম তার আজাজিল। সে আদমকে সিজদাহ্ করল না। সে বলল, “আমি আগুনের তৈরি। আদম মাটির তৈরি। আমি আদম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমি তাকে সম্মান করব না। সিজদাহ্ করব না।” সে আদমকে সিজদাহ্ করল না।

আজাজিল ছিল অহংকারী। আল্লাহ অহংকারীকে ভালোবাসেন না। আল্লাহ আজাজিলের ওপর অসন্তুষ্ট হলেন। আজাজিল হয়ে গেল শয়তান। নাম হলো তার ইবলিস। ইবলিস আল্লাহর আদেশ অমান্য করার দরুন অভিশপ্ত শয়তান হয়ে গেল।

আল্লাহ তায়ালা হ্যরত আদম (আ) কে জান্নাতের মধ্যে থাকতে দিলেন। আদম জান্নাতে আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তিতে থাকতে লাগলেন। কিন্তু এই অফুরন্ত আরাম-আয়েশের মধ্যেও তিনি নিঃসংজ্ঞা অনুভব করছিলেন। তাই দয়াময় আল্লাহ হ্যরত আদম (আ)-এর এক সঙ্গিনী বানালেন। নাম তাঁর হাওয়া (আ)।

আল্লাহ তাঁদের বললেন, ‘তোমরা উভয়ে জান্নাতে থাক। খুশিমতো পানাহার করো, আরাম-আয়েশ ও আনন্দ উপভোগ করো। কিন্তু সাবধান! কখনও এ গাছটির কাছে যেও না। যদি যাও তাহলে খুবই অন্যায় হবে। দারুণ ক্ষতি হবে।’

হ্যরত আদম (আ) এবং হ্যরত হাওয়া (আ) আল্লাহর হুকুম মেনে জান্নাতের মধ্যে মনের সুখে দিন কাটাতে লাগলেন। কিন্তু শয়তান ইবলিস অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য পথ খুঁজতে লাগল। সে জান্নাতে প্রবেশ করে তাঁদের ক্ষতি করার ফন্দি আঁটল। অবশ্যে একদিন তাঁদের ধোকা দিল। ঐ নিযিন্দ্ব গাছের ফল খাওয়াতে সক্ষম হলো। তাঁরা ইবলিসের প্ররোচনায় ঐ ফল খেয়ে আল্লাহর আদেশ অমান্য করলেন।

আল্লাহর আদেশ অমান্য করায় আল্লাহ তাঁদের ওপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি তাঁদের জান্নাত থেকে বের করে দিলেন। তাঁদের দুজনকে পৃথিবীতে নামিয়ে দিলেন। তাঁরা পৃথিবীতে এসে নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন। অনেক দিন যাবৎ সবসময় কাঁদতে থাকলেন। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। তওবা করতে থাকলেন।

অবশ্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁদের দোয়া কবুল করলেন। তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। তাঁদের তওবা কবুল করলেন। তাঁরা পৃথিবীতে নতুন জীবন শুরু করলেন। সুখ-শান্তিতে

বসবাস করতে থাকলেন। তাঁদের সন্তান হলো। পৃথিবী মানুষে ভরে উঠল। শুরু হলো মানবজাতির পথ্যাত্রা।

হ্যরত আদম (আ) আল্লাহর তাওহিদে বিশ্বাস করতেন। তিনি তাঁর সন্তানদের বললেন, “তোমাদের ও সারা বিশ্বের স্ফুর্তা আল্লাহ। তিনি এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করবে। তাঁরই কাছে মাথা নত করবে। তাঁরই কাছে সাহায্য চাইবে। তাহলে আল্লাহ তোমাদের শান্তি দেবেন। তোমরা জান্নাত লাভ করবে।

আর যদি তোমরা আল্লাহকে বিশ্বাস না কর। তাঁকে না মান। তাহলে দুঃখ পাবে। কষ্ট পাবে। আল্লাহ তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হবে। তোমরা জাহানামের কঠিন শান্তি ভোগ করবে।”

হ্যরত আদম (আ) ছিলেন প্রথম মানুষ এবং প্রথম নবি। আমরা সবাই তাঁর বংশধর। আমরা সবাই তাঁর জীবনাদর্শে উৎসাহিত হবো। আমরা ভুল বা অন্যায় করলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব। তওবা করব। আমাদের সন্তানদের ইসলাম শিক্ষায় গড়ে তুলব। আল্লাহর ইবাদত করব। সর্বদা আল্লাহকে খুশি রাখব। তাহলে পৃথিবীতে আমরা সুখ পাব। শান্তি পাব। মৃত্যুর পরও শান্তি পাব। জান্নাত লাভ করব। জাহানাম থেকে মুক্তি পাব।

পরিকল্পিত কাজ

হ্যরত আদম (আ) তাঁর সন্তানদের যে উপদেশ বাণী দিয়েছিলেন শিক্ষার্থীরা তা খাতায় সূন্দর করে লিখবে।

হ্যরত নূহ (আ)

হ্যরত আদম (আ)-এর ইতিকালের পর কেটে গেল অনেক বছর। বেড়ে গেল অনেক মানুষ। আস্তে আস্তে মানুষ ভুলে গেল আল্লাহকে। লিঙ্গ হলো তারা মৃতি পূজায়। পৃথিবীতে অন্যায়-অত্যাচার বেড়ে গেল। বৃক্ষ পেল ঝগড়া-মারামারি। অশান্তি আর অশান্তি। তখন আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য এক নবি পাঠালেন। এই নবির নাম হ্যরত নূহ (আ)।

হ্যরত নূহ (আ) আল্লাহর আদেশে দীর্ঘ সাড়ে নয়শ বছর পৃথিবীতে আল্লাহর দীনের দাওয়াত দেন। তিনি মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকলেন। ভালো কাজ করতে বললেন। মন্দ ও খারাপ কাজ বর্জন করার উপদেশ দিলেন।

তিনি মানুষকে বললেন: “তোমরা আল্লাহর প্রতি ইমান আন। এক আল্লাহর ইবাদত কর, মৃত্তিপূজা ত্যাগ কর। ভালো কাজ কর। মন্দ কাজ থেকে বিরত থাক। আখিরাতের জীবনের ওপর বিশ্বাস রাখ।” তাঁর এই দাওয়াতে মাত্র আশি জন নারী-পুরুষ সায় দিল। ইমান আনল। বাকি লোকজন তাঁর কথার গুরুত্ব দিল না। তাঁকে পাগল বলে উপহাস করল। কষ্ট দিতে লাগল। তারা কাফেরই থেকে গেল।

হ্যরত নূহ (আ) দীর্ঘদিন তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হলেন। অবশেষে হতাশ ও বিরক্ত হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, ‘হে আল্লাহ! আমি তাদেরকে তোমার দীনের পথে আনার জন্য আগ্রাম চেষ্টা করেছি, কিন্তু তারা আমার কথায় সাড়া দেয়নি। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আপনি তাদের ধ্বংস করে দিন।’

আল্লাহ তায়ালা হ্যরত নূহ (আ)-এর দোয়া করুল করলেন। আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিলেন, ‘কিছুদিনের মধ্যে তাদের ওপর আমার গজব নাজিল হবে। মহাপ্লাবন হবে। আল্লাহ তাঁকে একটি নৌকা তৈরি করতে বললেন। বলে দিলেন, গজবের আভাস দেখা দিলেই ইমানদার লোকজনদের নিয়ে নৌকায় উঠে যাবে। সাথে দরকারি আসবাবপত্রও নেবে।

হ্যরত নূহ (আ) আল্লাহর নির্দেশে এক বিরাট নৌকা তৈরি করলেন। আর সবাইকে বললেন, “আল্লাহর কথা না মানার কারণে ভীষণ আজাব আসবে।” কিন্তু লোকজন তাঁর কথা শুনল না। সৎপথে এগো না। তারা হ্যরত নূহ (আ)-কে আরও বেশি বেশি ঠাণ্ডা উপহাস করতে লাগল। তারা বলতে থাকল, “এ মরুভূমিতে কীভাবে নৌকা ভাসবে?”

অবশেষে সত্যি সত্যি তুফানের আলামত দেখা দিল। মাটি ফুঁড়ে পানি বের হলো। শুরু হলো প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি। বন্যা আসল। হ্যরত নূহ (আ) তাঁর ইমানদার লোকজনসহ নৌকায় আরোহণ করলেন। আরও নিলেন প্রতিটি জীবজন্তুর এক এক জোড়া এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র। তিনি নৌকা ছাড়ার আগে নিচের দোয়াটি পড়লেন :

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَهَا. إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ.

বিসমিল্লাহি মাজরিহা ওয়া মুরসাহা ইন্না রাকী লাগাফূরুর রাহিম ।

অর্থ : আল্লাহর নামে এটি চলবে এবং আল্লাহর নামে এটি থামবে। আমার প্রতিপালক অবশ্যই স্ফুরণশীল ও পরম দয়ালু।



হ্যরত নূহ (আ)-এর তৈরি নৌকা

পানি বেড়েই চলল, আরও প্রবল হলো বাঢ় ও বৃষ্টি। নৌকা সবকিছু নিয়ে পাহাড়ের মতো ঢেউয়ের মধ্যেও চলতে লাগল। চল্লিশ দিন পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি হলো। মাটি থেকেও প্রবল বেগে পানি উঠল। সবকিছু পানিতে ডুবে গেল। কাফেররা পানিতে ডুবে যাওয়ার ভয়ে পাহাড়ের ওপর আরোহণ করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকল পাহাড় ডুবে গেল। তখন কাফেররা আর যাবে কোথায়? সকলে পানিতে ডুবে মারা গেল। কাফেররা ধ্বংস হলো। এমনকি হ্যরত নূহ (আ)-এর ছেলে কেনান আল্লাহ ও নবির কথা অমান্য করায় পানিতে ডুবে মারা গেল। কেউ বাঁচতে পারল না।

এদিকে হ্যরত নূহ (আ) তাঁর দলবলসহ আল্লাহর রহমতে পানির ওপরে নৌকাতে ভাসতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আদেশে পানি আস্তে আস্তে কমে গেল। নৌকা জুড়ি পাহাড়ে এসে থামল। হ্যরত নূহ (আ) লোকজন, জীবজন্ম ও অন্যান্য সবকিছু নিয়ে নৌকা থেকে নেমে আসলেন। পৃথিবী আগের মতো আবার সবুজ শ্যামল হয়ে উঠল। তাঁরা পৃথিবীতে আবার নতুন জীবন শুরু করলেন।

হ্যরত নূহ (আ) ছিলেন সত্য ও ন্যায় প্রচারে আপোসহীন। প্রচুর বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি সত্য প্রচার থেকে একটুও পিছু হটেননি। আল্লাহর দীন প্রচারের জন্য তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন।

আমরা তাঁর জীবনাদর্শ অনুকরণ ও অনুসরণ করব। আল্লাহর দীন প্রচারের জন্য আমরা সারাজীবন পরিশৃম করব। আল্লাহর দীন প্রচারের জন্য শত বাধাবিপত্তি আসলেও আমরা পিছু হটব না। আমরা আল্লাহর ইবাদত করব। আর সকলকে আল্লাহর দীন মানার জন্য উৎসাহিত করব। যদি আমরা আল্লাহর আদেশ অমান্য করি তাহলে ধ্বন্স হয়ে যাব। আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হব।

পরিকল্পিত কাজ

হ্যরত নূহ (আ)-এর জীবনাদর্শ শিক্ষার্থীরা খাতায় সূচন করে লিখবে।

হ্যরত ইবরাহীম (আ)

প্রায় চার হাজার বছর আগের কথা। ইরাক দেশের বাবেল শহরে এক পুরোহিত পরিবারে হ্যরত ইবরাহীম (আ) জন্মগ্রহণ করেন। সেখানকার লোকেরা মূর্তিপূজা করত। মানুষকে প্রতারিত করত। পুরোহিতগণ রাজা-বাদশাহের সহযোগিতায় জনগণের ওপর অত্যাচার করত। তারা ভাগ্যের ভালোমন্দ জানার জন্য গণকদের শরণাপন্ন হত। গণকদের প্রতি ছিল তাদের অগাধ বিশ্বাস। তারা চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি সবকিছুর পূজা করত।

হ্যরত ইবরাহীম (আ) বাল্যকাল থেকেই মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি দেখলেন, চন্দ্র-সূর্য প্রতিদিন একই দিকে উদয় হয় এবং অস্ত যায়। মূর্তিতো নিজেদের হাতে গড়া। দেশের বাদশাহ আমাদের মতো একজন সাধারণ মানুষ। মানুষ কেন এদের

পূজা করবে? এদের কাছে মাথা নত করবে? আমাদের জীবন-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ এদের কারো হাতে নেই। আমরা এদেরকে ‘রব’ বলে স্বীকার করব কেন? বস্তুত আমাদের ‘রব’ একমাত্র আল্লাহ, যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর হাতেই সকলের জীবন-মৃত্যু। আমরা একমাত্র সেই আল্লাহরই ইবাদত করি।

হ্যরত ইবরাহীম (আ)–এর আমলে সেখানকার বাদশাহ ছিল নমরুদ। নমরুদ ছিল নির্মম অত্যাচারী বাদশাহ। হ্যরত ইবরাহীম (আ)–এর পিতার নাম ছিল আজর। আজর ছিলেন মৃত্তি উপাসক। হ্যরত ইবরাহীম (আ) স্বীয় পিতা ও অন্য সবাইকে বোঝালেন মৃত্তি পূজা করা ঠিক নয়। কিন্তু তারা মানল না। তারা তাঁর বিরুদ্ধে বাদশাহ নমরুদের কাছে নালিশ করল। বাদশাহ নমরুদের দরবার থেকে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো – হ্যরত ইবরাহীম (আ)–কে আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে। তাদের এ ভয়াবহ সিদ্ধান্তে তিনি একটুও বিচলিত হলেন না। আল্লাহর ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল।

নমরুদ হ্যরত ইবরাহীম (আ)–কে মেরে ফেলার জন্য বিশাল অগ্নিকুণ্ড তৈরি করল। আর সেই ঝুলন্ত আগুনে তাকে ফেলে দেওয়া হলো। কিন্তু আল্লাহর আদেশে আগুন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। হ্যরত ইবরাহীম (আ) অগ্নিদগ্ধ হওয়া থেকে রেহাই পেলেন। তাঁর কোনো ক্ষতি হলো না। কোনো কষ্ট হলো না। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বাঁচালেন। তাঁকে রক্ষা করলেন। রাখে আল্লাহ মারে কে! আল্লাহ বললেন :

يَنَارٌ كُوْنِيْ بَرْدَأً وَ سَلَمًا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ .

“হে আগুন! ইবরাহীমের জন্য তুমি ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক হয়ে যাও।”

হ্যরত ইবরাহীম (আ) মানুষকে আবার আল্লাহর পথে ডাকা শুরু করলেন। এবারেও তাঁর কথা কেউ শুনল না। বরং তাঁর ওপর অত্যাচার শুরু করল। শেষ পর্যন্ত তিনি স্বদেশ ইরাক ত্যাগ করে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে চলে গেলেন। সেখানে তিনি আল্লাহর দীন প্রচার করতে থাকেন। তিনি বলতে থাকেন, এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ‘রব’ নেই, মারুদ নেই। তোমরা সকলে আল্লাহর ইবাদত কর। এভাবেই তাঁর যৌবনকাল অতিবাহিত হলো।

হ্যরত ইবরাহীম (আ)–এর জীবনের শেষ ভাগ। ৮৬ বছর বয়স। আল্লাহর রহমতে তাঁর পুত্র হ্যরত ইসমাইল (আ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দুই পুত্র হ্যরত ইসমাইল (আ) এবং

হযরত ইসহাক (আ) নবি ছিলেন। একদা হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর আদেশে শিশু ইসমাইল ও তাঁর মা হাজেরাকে মক্কায় নির্বাসন দিয়ে আসলেন। জনমানবহীন পাহাড় ঘেরা মরু উপত্যকা মক্কা। আল্লাহর কুদরতে সেখানে পাথর ফেটে পানি বের হলো। সৃষ্টি হলো জমজম কূপ। পানির খবর পেয়ে সেখানে মানুষ বসবাস করতে লাগল। গড়ে উঠল জনবসতি। স্থাপিত হলো মক্কা নগরী।



কাবা শরিফ

আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আ) কে আদেশ দিলেন, ‘তোমার প্রিয় কন্তুকে আমার নামে কুরবানি দাও।’ তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন আল্লাহকে খুশি করার জন্য তিনি তাঁর প্রিয়তম পুত্র ইসমাইল (আ) কে কুরবানি দেবেন। তিনি পুত্রের গলায় ছুরি চালালেন। ঠিক এ সময় আল্লাহ খুশি হয়ে জান্নাত থেকে এক দুর্ম্মা পাঠালেন। ইসমাইল (আ)-এর পরিবর্তে দুর্ম্মা কুরবানি হয়ে গেল। আল্লাহ এই কুরবানি প্রথা কিয়ামত পর্যন্ত চালু রাখলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) এবং পুত্র ইসমাইল (আ) মিলে এখানেই কাবাগৃহ নির্মাণ করেন। তিনি আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও নবি। তাঁকে খলিলুল্লাহ বা আল্লাহর বন্ধু বলা হয়।

হ্যরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যেসব ত্যাগ স্বীকার করেছেন, আমরাও আমাদের জীবনে সেগুলো বাস্তবায়িত করব।

পরিকল্পিত কাজ :

শিক্ষার্থীরা হ্যরত ইবরাহীম (আ)-এর সময়ের লোকদের কার্যকলাপ খাতায় লিখবে।

হ্যরত দাউদ (আ)

হ্যরত দাউদ (আ) বনি ইসরাইল বংশে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি মেষ চরাতেন। তিনি ছিলেন অসীম সাহসী এবং অসাধারণ বীরত্বের অধিকারী। তিনি বাদশাহ তালুতের সেনাপতি ছিলেন। তাঁর যুদ্ধ কৌশল ছিল অসাধারণ। তিনি সেনাপতি থাকাকালে আল্লাহদ্বারা ও অত্যাচারী শাসক জালুতকে যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করেছিলেন। বাদশাহ তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে স্বীয় কন্যাকে তাঁর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। বাদশাহ মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তিনি অধিকাংশ সময় আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তিনি রাতে খুব কম ঘুমাতেন। প্রায় সারা রাত আল্লাহর ইবাদত করতেন। সালাত আদায় করতেন। আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতেন। তিনি একদিন পর একদিন আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাওম পালন করতেন।

তিনি একজন নবি ও রাসূল ছিলেন। তাঁর উপর প্রসিদ্ধ আসমানি কিতাব ‘যাবুর’ নামিল হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “দাউদ (আ)-কে আমি যাবুর দান করেছি।”

তিনি আল্লাহর নির্দেশে দীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। তাঁর কর্তৃত্বের ছিল সুমধুর। তিনি যাবুর কিতাব তিলাওয়াত করতেন। তাঁর সুমধুর তিলাওয়াত বনের পশু-পাখিরাও শুনত। এমনকি নদী ও সাগরের মাছগুলোও তাঁর তিলাওয়াত শুনে মুগ্ধ হতো। তিনি এবং তাঁর পুত্র সুলায়মান (আ) পুশ্পাখিদের ভাষা বুঝতেন। তাদের সাথে কথাবার্তাও বলতে পারতেন।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। তিনি ছিলেন সুশাসক ও সুবিচারক। জনগণ সব সময় তাঁর কাছ থেকে ন্যায় ও সুবিচার পেত। তাঁর বিচারব্যবস্থা ছিল নিখুঁত ও নিরপেক্ষ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদী। জনগণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য তিনি ছদ্মবেশে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন। অলিতে গলিতে ও বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে ঘুরে

দেখতেন। তিনি রাজকোষ থেকে কোনো অর্থসম্পদ গ্রহণ করতেন না। তিনি আল্লাহর কুদরতে স্বচ্ছে ইস্পাতের বর্ম বানাতেন। আর তা বিক্রি করে যা উপার্জন হতো তা দিয়ে নিজের সংসার চালাতেন। তিনি সন্তুর বছর বয়সে ইত্তিকাল করেন।

আমরা হ্যরত দাউদ (আ)-এর মত আল্লাহর ইবাদত করব এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করব। সুশাসক হব, জনগণের দুঃখ দুর্দশা মোচন করব। কারো কোনো ক্ষতি করব না। শুন্দ উচ্চারণে কুরআন তি঳াওয়াত করব। সালাত আদায় করব। সাওম পালন করব। আল্লাহকে খুশি রাখব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা হ্যরত দাউদ (আ)-এর ন্যায়বিচার ও সুশাসনের বর্ণনা খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

হ্যরত সুলায়মান (আ)

হ্যরত সুলায়মান (আ) ছিলেন হ্যরত দাউদ (আ)-এর পুত্র। তিনি নবি ও বাদশাহ ছিলেন। প্যালেস্টাইনে তাঁর রাজত্ব ছিল। ইসরাইলি বাদশাহগণের মধ্যে ক্ষমতায় ও শান শওকতে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ।

তিনি জিন-পরী, পশু-পাখি, গাছপালার ভাষা বুঝতে পারতেন। আল্লাহর আদেশে এসব তাঁর অধীনে ছিল। এমনকি বাতাসও তাঁর অধীনে ছিল। আর আল্লাহর হুকুমে এসব কিছুই তাঁর নির্দেশ মেনে চলত। আল্লাহর রহমতে যাকে যা নির্দেশ দিতেন সে তা পালন করত। এত বড় বাদশাহ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে কোনো অহংকার ছিল না।

তিনি আল্লাহর ইবাদত করতেন। তিনি অনেক ক্ষমতা ও শান-শওকতের মধ্যে থেকেও আল্লাহকে ভূলে যাননি। তিনি বলতেন, “আল্লাহ এক। তাঁর কোন শরিক নেই। তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। কারো ওপর অন্যায়-অত্যাচার করো না। আল্লাহর শাস্তির তয় করো।” তিনি সুশাসক ও সুবিচারক ছিলেন।

একটি ঘটনা

একদা দুইজন স্ত্রীলোকের প্রত্যেকেই একটি শিশুকে তার নিজের বলে দাবি করেন। তারা দুইজনে বাগড়া করতে করতে মীমাংসা করার জন্য হ্যরত দাউদ (আ)-এর দরবারে

উপস্থিত হন। হ্যরত দাউদ (আ) তাদের দুইজনের বক্তব্য শুনলেন। অতঃপর স্বীয় পুত্র হ্যরত সুলায়মান (আ) কে এর সুবিচার করে দিতে বললেন। হ্যরত সুলায়মান (আ) সব কথা শুনে বললেন যে, দুইজনই যখন শিশুটিকে তার নিজের বলে দাবি করছে, তখন এই শিশুটিকে দুর্খণ্ড করে উভয়ের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া উচিত। অতঃপর তিনি শিশুটিকে মাটিতে শুইয়ে দুর্খণ্ড করার জন্য তলোয়ারটি উঁচু করলেন। এমন সময় একজন মহিলা চিৎকার দিয়ে বললেন, “আমি শিশুটির মা নই। এ মহিলাটি শিশুর মা। আপনি তাকেই শিশুটি দিয়ে দিন। দয়া করে শিশুটিকে কাটবেন না।” তখন সুলায়মান (আ) বিচারের রায়ে বললেন, “যে মহিলাটি আমাকে হত্যা করতে বাধা দিয়েছেন, তিনিই সত্যিকারের মা। সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য তিনি মিথ্যা কথা বলেছেন।” তিনি শিশুটিকে তার আসল মাকে দিয়ে দিলেন। আর নকল মাকে শাস্তি দেওয়া হলো। এটি সুবিচারের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

হ্যরত সুলায়মান (আ) আল্লাহর হুকুমে বৃন্দ বয়সে বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করেন। তিনি লাঠিতে ভর করে বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ কাজ তদারকি করেন। এ অবস্থায় তাঁর ইন্তিকাল হয়। বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর মৃতদেহটি জীবিত অবস্থায় যেভাবে ছিল সেভাবেই থাকে। নির্মাণ কাজ শেষ হলে তাঁর হাতের লাঠিটা ডেঙ্গে ঘায়। আর তিনি মাটিতে পড়ে যান। তখন সকলে অবাক হয়। এভাবে আল্লাহর হুকুমে তিনি ইন্তিকাল করেন। আমরা আল্লাহর ইবাদত করব। ন্যায়পরায়ণ ও সৎ হব। আমরা অহংকারী হব না।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা হ্যরত সুলায়মান (আ)-এর সুবিচারের কাহিনিটি খাতায় লিখবে।

হ্যরত ঈসা (আ)

হ্যরত ঈসা (আ) ফিলিস্তিনের ‘বায়তুল লাহাম’ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ‘বায়তুল লাহাম’ স্থানটি বর্তমানে বেথেনহাম নামে পরিচিত। তাঁর আশ্মার নাম হ্যরত মরিয়ম (আ)। আল্লাহর অসীম কুদরতে পিতা ছাড়াই হ্যরত মরিয়ম (আ)-এর গর্ভে হ্যরত ঈসা (আ) জন্মগ্রহণ করেন।

মহান আল্লাহর বিশেষ কুদরতে তিনি দোলনায় থাকাকালেই শিশু অবস্থায় কথাবার্তা বলার অলৌকিক শক্তি লাভ করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে কিছু মোজেয়া বা অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছিলেন। যেমন- তিনি আল্লাহর হুকুমে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতেন। জন্মান্ধকে ঢোকের দৃষ্টিশক্তি দান করতেন। ধৰ্বল, শ্বেত ও কুষ্ঠ রোগীদের তিনি আল্লাহর রহমতে রোগমুক্ত করে দিতেন।

হ্যরত ঈসা (আ) ছিলেন আসমানি কিতাব প্রাপ্ত একজন নবি ও রাসূল। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওপর ‘ইনজিল’ কিতাব নাইল করেন। সে সময়ে সেখানকার লোকেরা আল্লাহকে তুলে গিয়ে নানা দেব-দেবীর পূজা করত। হ্যরত ঈসা (আ) তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানালেন। শিরক থেকে বিরত থাকতে বললেন। সকল দুর্নীতি ও খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে বললেন।

সেখানকার লোকজন হ্যরত ঈসা (আ)-এর কথা মানল না। তারা আল্লাহর ইবাদত করল না। তারা তাঁর ঘোর শত্রুতে পরিণত হলো। তারা তাঁকে আরো নিষ্ঠুর কষ্ট দিতে থাকল। এমনকি তারা তাঁকে হত্যা করার ঘৃণ্য ঘড়্যন্ত করল। একদিন তারা তাঁকে হত্যা করার জন্য এক ব্যক্তিকে ঘরের মধ্যে পাঠাল। কিন্তু রাখে আল্লাহ, মারে কে। মহান আল্লাহ তাঁর অসীম কুদরতে তাঁকে জীবিত অবস্থায় আসমানে তুলে নিলেন। আর ঘরের মধ্যে যে লোকটি তাঁকে হত্যা করার জন্য প্রবেশ করেছিল, তার আকৃতি হ্যরত ঈসা (আ)-এর আকৃতির মতো হয়ে গেল। সে ঘর থেকে বের হতেই তার সাথীরা তাঁকে ঈসা (আ) ভেবে ঝুশ বিদ্ধ করে হত্যা করল।

এভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় রাসূল ও বাস্তা হ্যরত ঈসা (আ) কে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে আসমানে নিরাপদে রাখলেন। শেষ জামানায় কিয়ামতের পূর্বে তিনি পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন। মিথ্যাবাদী দাঙ্গালকে তিনি হত্যা করবেন। ৪০ বছর পৃথিবীতে অবস্থান করবেন। তিনি পৃথিবীতে এসে আমাদের প্রিয় নবি হ্যরত মুহাম্মদ (স)-এর উন্মত হিসেবে দীন প্রচার করবেন। তিনি স্বাভাবিকভাবে ইন্তিকাল করবেন। আমাদের মহানবি (স)-এর রওজা মুবারকের পাশে তাঁকে দাফন করা হবে।

আমরা হ্যরত ঈসা (আ) কে নবি-রাসূল বলে স্বীকার করব। আল্লাহর ইবাদত করব। হ্যরত ঈসা (আ)-এর মোজেয়াসমূহ বিশ্বাস করব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা হ্যরত ঈসা (আ)-এর মোজেয়াগুলো খাতায় লিখবে।

অনুশীলনী

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও

১. মহানবি (স) কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ?

ক. ৫২২ খ্রি:

খ. ৫৭০ খ্রি:

গ. ৬১০ খ্রি:

ঘ. ৬২২ খ্রি:

২. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রথম দুখমাতা কে ছিলেন ?

ক. সোয়েবা

খ. হালিমা

গ. আম্বিয়া

ঘ. সালেহা

৩. কত বছর বয়সে মুহাম্মদ (স)-এর দাদা মারা যান ?

ক. ৩ বছর

খ. ৫ বছর

গ. ৭ বছর

ঘ. ৮ বছর

৪. নবুয়তের কত সনে মহানবি (স)-এর মিরাজ হয়েছিল ?

ক. দশম

খ. একাদশ

গ. দ্বাদশ

ঘ. চতুর্দশ

৫. মহানবি (স) কত খ্রিস্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেন ?

ক. ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে

খ. ৬১০ খ্রিস্টাব্দে

গ. ৬২২ খ্রিস্টাব্দে

ঘ. ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে

৬. হযরত আদম (আ) কিসের তৈরি ?

ক. আগুন

খ. পাথর

গ. মাটি

ঘ. পানি

৭. হযরত নূহ (আ) কত বছর আল্লাহর দীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন ?

ক. সাড়ে ছয় শ বছর

খ. সাড়ে নয় শ বছর

গ. সাড়ে আট শ বছর

ঘ. সাড়ে সাত শ বছর

৮. হ্যরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতার নাম কী?

- | | |
|---------|----------|
| ক. আয়ম | খ. হাতেম |
| গ. আজর | ঘ. আমর |

৯. হ্যরত দাউদ (আ) কোন বৎশে জন্মগ্রহণ করেন?

- | | |
|---------------|--------------|
| ক. বনি ইসরাইল | খ. বনি তামীম |
| গ. বনি কুরাইশ | ঘ. বনি গালিব |

১০. আল্লাহ তায়ালা হ্যরত ঈসা (আ)-এর ওপর কোন কিতাব নাজিল করেন?

- | | |
|----------|-----------|
| ক. কুরআন | খ. তাওরাত |
| গ. ইনজিল | ঘ. যাবুর |

১১. হ্যরত সুলায়মান (আ)-এর পিতার নাম কী?

- | | |
|-------------------|----------------------|
| ক. হ্যরত ঈসা (আ) | খ. হ্যরত দাউদ (আ) |
| গ. হ্যরত মুসা (আ) | ঘ. হ্যরত ইবরাহীম (আ) |

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর

১. হ্যরত মুহাম্মদ (স) —— বৎশে জন্মগ্রহণ করেন।
২. ফিজার —— গ্রোত্র কুরাইশদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল।
৩. —— পর্বতের গুহায় হ্যরত মুহাম্মদ (স) ধ্যান মগ্ন থাকতেন।
৪. হিজরতের সময় মহানবি (স) —— পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেন।
৫. মদিনা সনদে —— টি ধারা ছিল।
৬. আল্লাহর কোন —— নেই।
৭. হ্যরত নৃহ (আ) আল্লাহর নির্দেশে এক বিরাট —— তৈরি করলেন।
৮. হ্যরত ইবরাহীম (আ)-এর আমলে সেখানকার বাদশাহ ছিলেন ——।
৯. হ্যরত দাউদ (আ) শৈশবে —— চরাতেন।
১০. হ্যরত ঈসা (আ) আল্লাহর হুকুমে মৃত ব্যক্তিকে —— করতেন।

গ. বাম পাশের শব্দগুলোর সাথে ডান পাশের শব্দগুলো মিলাও

বাম পাশ	ডান পাশ
মহানবি (স)–এর পিতা	আব্দুল মুভালিব
মহানবি (স)– এর মাতা	হালিমা
মহানবি (স) – এর দাদা	আবু তালিব
মহানবি (স) – এর চাচা	আব্দুল্লাহ
মহানবি (স)–এর দুধমা	আমিনা
হযরত আদম (আ)–এর সঙ্গীর নাম	থামল
নৌকা জুদি পাহাড়ে এসে	হযরত মরিয়ম (আ)
হযরত দাউদ (আ) বাদশাহ তালুতের	হযরত হাওয়া (আ)
হযরত ঈসা (আ) এর মায়ের নাম	সেনাপতি ছিলেন

ঘ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

১. পাদ্রি বহিরা হযরত মুহাম্মদ (স) সম্বন্ধে কী মন্তব্য করেছিলেন ?
২. হযরত মুহাম্মদ(স)–এর গঠিত সংঘের নাম কী ?
৩. হাজরে আসওয়াদ কোথায় স্থাপন করা হয়েছিল ?
৪. মহানবি (স) প্রথমে কাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করেন ?
৫. আনসার কারা ?
৬. মুহাজির কাদের বলে ?
৭. বদর যুদ্ধের কারণ কী ?
৮. মদিনা সনদ কী ?
৯. হুদাইবিয়ার সন্ধি কী ?
১০. বিদায় হজ কাকে বলে ?
১১. পৃথিবীর আদি মানব কে ছিলেন ?
১২. হযরত নৃহ (আ)–এর সময় কী আজাব এসেছিল ?
১৩. ইবরাহীম (আ) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?
১৪. হযরত দাউদ (আ)–এর ওপর কোন কিতাব নাজিল হয় ?
১৫. হযরত দাউদ (আ)–এর বীরত্বের উদাহরণ দাও ।

১৬. হ্যরত ঈসা (আ)-এর মোজেবাগুলো উল্লেখ কর।
১৭. হ্যরত ঈসা (আ) বর্তমানে কোথায় জীবিত আছেন?
১৮. আল্লাহর হুকুমে হ্যরত সুলায়মান (আ)-এর অধীনে কী কী ছিল?

৫. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. হ্যরত মুহাম্মদ(স)-এর জন্ম ও বংশ পরিচয় দাও।
২. হ্যরত মুহাম্মদ(স)-এর জন্মের সময় আরবের অবস্থা কেমন ছিল?
৩. শান্তি সংঘের উদ্দেশ্যগুলো কী কী?
৪. হ্যরত মুহাম্মদ(স)-এর নবুয়ত লাভের ঘটনা সংক্ষেপে লেখ।
৫. নবুয়ত লাভের পর মহানবি (স) কী কী শিক্ষা দিলেন?
৬. মদিনা সনদ কী? এর কয়েকটি ধারা উল্লেখ কর।
৭. বদর যুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর।
৮. মক্কা বিজয় ও রাসুল (স)-এর অপূর্ব ক্ষমার দৃষ্টান্ত বর্ণনা কর।
৯. বিদায় হজে মহানবি (স) যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা সংক্ষেপে লেখ।
১০. কুরআন মজিদে উল্লিখিত ১০ জন নবির নাম লেখ।
১১. আল্লাহ ফেরেশতাদের কী আদেশ দিলেন?
১২. হ্যরত নূহ (আ) মানুষকে কী কী বললেন?
১৩. হ্যরত ইবরাহীম (আ) অগ্নিকুণ্ডে কীভাবে অক্ষত থাকেন?
১৪. হ্যরত দাউদ (আ)-এর ন্যায়পরায়ণতা ও সুশাসন সম্পর্কে লেখ।
১৫. হ্যরত ঈসা (আ) সেখানকার লোকদের কী কী উপদেশ দিলেন?

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য, পঞ্চম শ্রেণি-ইসলাম

তোমরা একে অন্যের দোষ অব্দেষণ করো না।

— আল কুরআন



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য